ভালোবাসার ছোয়া

– নাজিম চৌধুরী

বোধহয় ভালোবাসার সবচেয়ে মূল্যবান এবং সহজ প্রকাশ হলো প্রিয় মানুষটির ছোয়া। সদ্যজাত শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক সবার মাঝেই সমানভাবেই রয়েছে এই আকুতি। ১৯১৮ সালে এক জার্মান ডাক্তার আর্নেস্ট মোরো দারুণ এই ব্যাপারটি গবেষণা করে বের করেন। মায়ের গর্ভ থেকেই শিশুরা জড়িয়ে ধরা বা আকড়িয়ে ধরার ব্যাপারটি শিখে আসে।

তার গবেষণায় তিনি দেখান, যে শিশুরা জন্মের পর পর্যাপ্ত পরিমাণে বাবা–মায়ের ছোয়া বা স্পর্শ পায় না, পরবর্তীকালে তাদের মানসিক বৃদ্ধি সেসব শিশুদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম হয় যারা বাবা–মায়ের আদরের ছোয়া বেশি পায়। বোধহয় মানুষের জন্মগত এই ব্যাপারটা সারা জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিগত সম্পর্কেই বিরাট এক ভূমিকা রাখে। সে জন্য আমরা সব সময়েই চাই, ভালোবাসার মানুষটি আমাদের সারাক্ষণ জড়িয়ে রাখুক পরম মমতায়। তাই শরীরের উষ্ণতা, মুখে প্রিয়জনের চুলের আলতো ছোয়া, ঘাড়ে হালকা গরম নিশ্বাসের পরশ – এসবই আমাদের বিশেষ সম্পর্ককে আরো অর্থবহ করে তোলে। মা–শিশুর ভালোবাসাই হোক কিংবা ভাইবোনের জড়িয়ে ধরা বা বন্ধুরা মিলে এক সঙ্গে হুড়োহুড়ি – সব কিছুতেই ভালোবাসার ছোয়াটাই মুখ্য হয়ে ওঠে, এসবের মাঝে সবচেয়ে সেরা অবশ্যই ভালোবাসার মানুষের ভালোবাসার ছোয়া। এক কথায় তুলনাহীন।

এই ভালোবাসার ছোয়াছুয়ির মাঝ দিয়েই দুজন মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলে তাদের আনন্দময় শারীরিক সম্পর্ক। সেক্সের মতো এতো বেশি চর্চিত এবং আনন্দময় ঘটনা বোধহয় মানুষ আর কিছু করেনি। যদিও সামাজিকভাবে প্রকাশ্যে আমরা সেক্স সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলাপ–আলোচনা করি না তবুও আমাদের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে যে সেক্সের অবস্থান তাতে কেউ–ই দ্বিমত করবেন না।

প্রাকৃতিকভাবে মানুষের জীবনের এই চরম আনন্দময় মুহূর্তের উপস্থিতি বংশবৃদ্ধির জন্য হলেও আমরা নিজেদের মানসিক সুস্থতায় এর ব্যবহার শিখে নিয়েছি। শুধু মানুষই নয়, প্রাণী জগতে এ রকম অনেক জীবই রয়েছে যারা শুধু ভালোবাসার প্রকাশ বা শারীরিক আনন্দের জন্যই সেক্স করে থাকে। তাই সেক্সকে শুধু বংশবৃদ্ধির উপায় বললে ভুল হবে। আমাদের জীবনের অনেক আনন্দ–বেদনা, ভালোবাসা–ঘৃণা, শিল্প–সংস্কৃতি, এমনকি যুদ্ধের মতো বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনার পেছনেও রয়েছে সেক্সের বিশাল ভূমিকা।

মানুষের মানসিক এবং শারীরিক গঠনই এমন যে তা অন্যের শারীরিক সান্নিধ্য ছাড়া পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না। সদ্যজাত শিশু যখন মায়ের দুধ পান করে তখন থেকেই সে শারীরিক সান্নিধ্যের ব্যাপারটা উপভোগ করতে শেখে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের নানান ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেও শরীরের উষ্ণতা সব সময়ই সে চায়। বাবা–মায়ের জড়িয়ে ধরার মাঝেই হোক কিংবা স্ত্রী বা প্রেমিকার আবেগময় আলিঙ্গন – এতোটুকু ছোয়া তাকে জোগায় জীবন যুদ্ধে নামার নতুন শক্তি। ছোটবেলার সেই নির্ভরতার ছোয়াই এক সময় পরিণত হয় সেক্সুয়ালটি বা যৌনতায়। তাই সহজেই বলা যায় যৌনতার বীজ আমাদের মাঝে প্রোথিত হয় সেই ছোটবেলাতেই।

সাইকিয়াস্ট্রিস্টরা মানুষের যৌনতাকে শুধু সন্তান উৎপাদনের মাঝে সীমাবদ্ধ বলে স্বীকার করেন না। তাদের ভাষায়, মানুষের যৌনতা অনেক বেশি বন্ধন তৈরি করার জন্য। আমাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য। একটা কথা তারা প্রায়ই বলেন, ভালোবাসার মানুষ ছাড়া আনন্দময় যৌন সম্পর্ক সম্ভব নয় আর যার সঙ্গে আপনার নিয়মিত আনন্দকর যৌন সম্পর্ক রয়েছে তাকে না ভালোবেসে পারা যায় না।

যুগ যুগ ধরে দেখা গেছে, স্বামী–স্ত্রী হিসেবে যারা সুখী তাদের যৌন জীবনও খুব আনন্দময় হয়। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, তারা সুখী দেখে তাদের যৌন জীবন আনন্দময়, নাকি যৌন জীবনে তারা সুখী বলে তাদের দাম্পত্য জীবন আনন্দময়? সুখ এবং যৌনতার এই অদৃশ্য মেলবন্ধন সব সময়ই আমাদের ভাবিয়েছে। মনের

ব্যাপারগুলো কিছুটা বোঝা গেলেও আমাদের শরীর কিভাবে এতে সাড়া দেয় তা এখনো বিজ্ঞানীদের পুরোপুরি বোঝার বাইরে। তবে যতোটুকুই জানা গেছে তাতে একটি জিনিস স্পষ্ট, যৌনতা আমাদের মানসিক এবং দৈহিক দু'প্রক্রিয়ারই সম্মিলিত ফসল। দুয়ের সফল সমন্বয়েই আমাদের জীবন হয়ে উঠতে পারে আনন্দময়।

ভালোবাসার ইচ্ছা

৫০ বছর বয়স্ক রোজলিন ওয়াশিংটন বেচে আছেন মেডিকাল সায়েন্সের উন্নতির একজন অনন্য সাক্ষী হিসেবে। তার বয়স যখন ৪২ তখন এক জটিল অসুখে তার ডিম্বাশয় ও জরায়ু দুটোই ফেলে দিতে হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল যে, সেরে উঠতে অনেক সময় লাগবে তার। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, এর সঙ্গে সঙ্গে সেক্সুয়াল ডিজায়ার বা যৌন আকাঙ্ক্ষাও হারিয়ে ফেলবেন তিনি। তার ভাষায়, ওই অনুভূতিটুকু ছাড়া নিজেকে একজন পূর্ণ নারী হিসেবে ভাবতে পারতেন না তিনি।

আট বছর পর বিখ্যাত *প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল কম্পানি* এ ধরনের সেক্সুয়াল অনুভূতিহীন মহিলাদের জন্য টেস্টোস্টেরন প্যাচ তৈরি করে। টেস্টোস্টেরন এক ধরনের সেক্স হরমোন যা প্রধানত পুরুষ দেহের বৈশিষ্ট বিকাশে সাহায্য করে। কিন্তু নারী দেহে সেক্সুয়াল ডিজায়ার তৈরিতে এর ভূমিকা অপরিসীম। তাই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা নারী দেহে কৃত্রিমভাবে এই হরমোন সরবরাহের মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যায় যারা ভুগছেন তাদের চিকিৎসার উদ্যোগ নেন।

এক বছর টেস্টোস্টেরন প্যাচ ব্যবহার করার পর রোজলিন এবং তার মতো আরো ৭৪জন মহিলার জীবন সত্যিই বদলে গিয়েছিল। নারী সুলভ সব অনুভূতিগুলো আবারও পুরোপুরিভাবে উপভোগ করতে পারছিলেন তিনি। ২০০০ সালে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে এ সংক্রান্ত একটি আর্টিকলও প্রকাশিত হয়। কিন্তু মজার কথা হলো, এ ৭৫জন মহিলার সবাইকেই টেস্টোস্টেরন প্যাচ দেয়া হয়নি। এদের কয়েকজন মহিলাকে টেস্টোস্টেরন ছাড়াই প্যাচ দেয়া হয়েছিল ব্যবহার করার জন্য। অর্থাৎ টেস্টোস্টেরন দেয়া হোক বা না হোক শুধু চিকিৎসা চলছে এবং সমস্যা দূর হয়ে যাবে এ ধরনের চিন্তা থেকেই তারা তাদের শারীরিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে স্বাভাবিক যৌন জীবনে ফিরে এসেছিলেন।

এ গবেষণা থেকেই প্রমাণিত হয়েছে সেক্সুয়ালিটি কতো জটিল একটি বিষয়। কিসের জন্য যে একজন মানুষের সেক্সুয়াল ডিজায়ার তৈরি হবে তা আসলেও বলা কঠিন। তবে শুরুটা যেভাবেই হোক না কেন, সেক্স যে হরমোন এবং নিউরোট্রান্সমিটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি জটিল বায়োকেমিকাল প্রক্রিয়া মাত্র তাতে বিজ্ঞানীদের সন্দেহ নেই। তারপরও বিজ্ঞানীরা এটা জানার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেননা যৌন সমস্যায় ভুগছেন এমন মানুষের সংখ্যা এ পৃথিবীতে কোটি কোটি। এবং তারই ফলে আমরা এখন টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন, অক্সিটোসিন, ডোপামিন, সেরোটোনিন, নরপাইনেফ্রন নাইট্রক অক্সাইড, ভেসোঅ্যাকটিভ ইনটেস্টিনাল পলিপেপটিড এবং এ ধরনের আরো অনেক হরমোন এবং বায়োকেমিকালের নাম জানি।

বিজ্ঞানীরা সব সময়ই বলে আসতেন যে, সেক্স বা সেক্সুয়ালিটির শতকরা ৯০ ভাগই হলো মানসিক ব্যাপার। গবেষণায় এও জানা গেছে যে, ব্রেইনের সেনসরি ভেগাস নার্ভ, মিডব্রেইন রেটিকুলার ফরমেশন, বেসাল গ্যানগিলা, অ্যান্টেরিয়র ইনসুলা করটেক্স, অ্যামিগডালা, সেরেবেলাম এবং হাইপোথালামাস কিভাবে সেক্সে ভূমিকা রাখে।

এতো কিছু জানার পরেও বিজ্ঞানীরা এখনো বের করতে পারেননি পুরুষ এবং নারী দেহে এরা কিভাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করে কিংবা কোনটার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তবে যে গতিতে বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে তাতে অচিরেই জানা যাবে এখনো অজানা নানা তথ্য।

১৯৭০ সালের আগ পর্যন্ত যৌনতা বলতে শুধু শারীরিক ব্যাপারগুলোই বোঝাতো। সত্তরের দশকে এসে হেলেন সিংগার কাপলান নামের একজন সাইকিয়াট্রিস্ট নতুন একটি তত্ত্ব দেন। তার মতে, শরীর যৌনতায়

সাড়া দেয়ার আগে প্রতিটি মানুষের মনে যৌনতা বা সেক্সুয়াল ডিজায়ার তৈরি হয়। এর পাশাপাশি শারীরিক মিলন বা যৌনতার উদ্দেশ্য নিয়েও বেশ বিতর্ক ওঠে। পুরুষদের জন্য অর্গাজম যৌনতার শেষ পর্যায় বা লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হলেও নারীদের জন্য অর্গাজমের চেয়ে শারীরিক মিলনের আনন্দ বা সন্তুষ্টিও যে মূল উদ্দেশ্য হতে পারে তা নিয়ে অনেকেই তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

একই সঙ্গে বিতর্ক ওঠে নারী এবং পুরুষের সেক্স সংক্রান্ত চিন্তা–ভাবনা ও তার প্রকাশ নিয়ে। নামকরা সব সাইকিয়াট্রিস্টরা বলেন যে, পুরুষদের তুলনায় নারীরা কম সেক্স নিয়ে মাতামাতি করেন। এর জন্য বায়োলজিকাল কারণের চেয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই বেশি দায়ী। নানান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে পুরুষদের মতো নারীরাও যৌন উত্তেজক কিছু দেখলে উত্তেজনা বোধ করেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে পার্থক্য হলো যে, নারীরা সে সাময়িক উত্তেজনাকে প্রকাশ করে না আর পুরুষরা এতো উত্তেজিত হয়ে যায় যে, অর্গাজম না করে তারা থামতে পারে না। আসলে আমাদের মস্তিষ্ক এবং যৌনাঙ্গের মধ্যের এ সম্পর্কের অনেকখানিই অজানা।

সেক্সুয়াল ডিজায়ার বা যৌন ইচ্ছা বেশ জটিল একটি অনুভূতি। মানসিকভাবে আমরা উত্তেজনা বোধ করার পরই কেবল আমাদের শরীর তাতে সাড়া দেয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গে এবং নারীদের ক্ষেত্রে যোনি এবং ক্লিটোরিসে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্ক বা ব্রেইন শরীরকে সেক্সের জন্য তৈরি করে। পুরুষ দেহে রক্তের এই সঞ্চালনের জন্য যে হরমোন দায়ী তার নাম *ভেসোঅ্যাকটিভ ইনটেস্টিনাল পলিপেপটাইড*। তবে তারও আগে এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয় *নাইট্রিক অক্সাইড* নামের একটি কেমিকালের জন্য। এই কেমিকালটি রক্তনালীর সংকোচন ও প্রসারণে সাহায্য করে। যখন আমরা মানসিকভাবে উত্তেজিত হই বা ভায়াগ্রা অথবা লেভিট্রার মতো ওষুধ সেবন করি তখন রক্তে নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়। যেহেতু পুরুষাঙ্গের উথান সেখানে রক্তপ্রবাহের ওপর নির্ভরশীল তাই এ জাতীয় ওষুধ সেবনে উথান দৃঢ় হয়।

এককভাবে যদি কোনো কেমিকালের নাম বলতে বলা হয় যা কি না পুরুষ দেহে যৌন আকাঙ্ক্ষা বা কামনা তৈরি করে তবে বলতে হবে *টেস্টোস্টেরন*–এর কথা। পুরুষের সব কিছুই এ হরমোনটির ওপর নির্ভরশীল। যারা টেস্টোস্টেরন স্বল্পতায় ভুগছেন তারা সাধারণত বিভিন্ন রকমের যৌন সমস্যার মুখোমুখি হন। নারীদের ক্ষেত্রেও টেস্টোস্টেরন একই ভূমিকা পালন করে। একক টেস্টোস্টেরন বা ইস্ট্রোজেন নামে আরেক হরমোনের চেয়ে এ হরমোন দুটি যৌথভাবে কাজ করে নারীর যৌন চাহিদা তৈরি করে। যে কোনো একটির অভাবে নারীরা যৌন সমস্যায় পড়েন।

তবে মানবদেহে শুধু এ দুটো হরমোনই নয় আরো কিছু হরমোন রয়েছে যেগুলো আমাদের মুড তৈরিতে ভূমিকা রাখে। যেমন বলা যাক ডোপামিনের কথাই। এই নিউরোট্রান্সমিটারটি ব্রেইনে কাজ করার মাধ্যমে আমাদের দেহে যৌন অনুভূতি তৈরি করে। ঠিক একইভাবে সেরোটোনিন নামের আরেক হরমোনও কাজ করে। লক্ষ্য করা গেছে, ডোপামিন ও সেরোটোনিন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে আমাদের দেহকে সেক্সের জন্য তৈরি করে এবং অর্গাজমের মাধ্যমে তাদের কাজ বা অ্যাকটিভিটি শেষ করে।

নরপাইনেফ্রন আর এপিনেফ্রনের কথা এ সূত্রে না বললেই নয়। এই কেমিকাল দুটো আমাদের দেহে এনার্জি জোগায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেক্সের সময় এদেরও খুব সক্রিয় অবস্থায় দেখা যায়।

অক্সিটোসিন নামের আরেকটি চমৎকার হরমোন রয়েছে আমাদের দেহে। পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, ওভারি এবং টেসটিসে এই হরমোনটি তৈরি হয়। প্রসবের সময় যোনিপথের সংকোচন প্রসারণ, মায়ের দুধ তেরি এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গের পেশীগুলোকে অর্গাজমের জন্য তৈরি করে তোলে এ কেমিকালটি। অক্সিটোসিনকে কাডল (Cuddle) হরমোনও বলা হয়। কারণ, পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রেমাসক্ত কোনো যুগল যদি হাতে হাত

রাখে বা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে তাহলে দেহে অক্সিটোসিন–এর মাত্রা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, যুগলের একজনের আরেকজনের প্রতি যে ভালোবাসার বন্ধন তা আসলে অক্সিটোসিনেরই ফল।

ইদানীং আরেকটি বায়োকেমিকাল নাম বেশ জোরে শোনা যাচ্ছে। *ফেরোমোন* নামের এই কেমিকালটি আমাদের দেহের নিজস্ব গন্ধের জন্য দায়ী। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন ফেরোমোনের জন্যও একজন মানুষ আরেকজনের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বামী–স্ত্রী বা প্রেমিক–প্রেমিকা যে একে অন্যের গায়ের গন্ধেই উত্তেজনা বোধ করেন তার কারণও এই ফেরোমান।

যৌনতা এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বায়োকেমিকাল উপাদানগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীদের যে নিরন্তর গবেষণা তা সত্যিই আমাদের জন্য দারুণ এক ঘটনা। যৌনতা এবং এ সংক্রান্ত সসম্যা নিয়ে প্রচুর মানুষ জীবন কাটাচ্ছে। সেদিন হয়তো দূরে নয় যেদিন আমরা এই বায়োকেমিকাল, হরমোনগুলোর হ্রাস–বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের জীবনকেও আরো আনন্দময় করে গড়ে তুলতে পারবো।

ব্রেইনিক ভালোবাসা

অ্যানথ্রপলজিস্ট বা নৃবিজ্ঞানী হেলেন ফিশার একজন ভালোবাসা বিশেষজ্ঞ। সম্প্রতি তিনি ''হোয়াই উই লাভ : দি নেচার অ্যান্ড কেমিস্ট্রি অফ রোমান্টিক লাভ'' নামে একটি বই লিখেছেন। ভালোবাসার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ভরপুর বইটির সারাংশ তুলে ধরা হলো এখানে আপনাদের জন্য।

মানুষ কেন ভালোবাসে? ভালোবাসা কি মনে তৈরি হয়, নাকি কিছু কেমিকাল আর ব্রেইন অ্যাকটিভিটির ফল মাত্র? প্রশ্নগুলো প্রায়ই ঘুরতো আমার মনে। কারণ, কিছুটা হলেও জানতাম যে, *ডোপামিন, নরপাইনেফ্রন* আর *সেরোটোনিন* নামের তিনটি ব্রেইন কেমিকাল মানুষের আবেগের ওঠানামার জন্য দায়ী। কেমন হতো যদি দেখা যায়, ভালোবাসার তীব্র ভালো লাগা, নিদ্রাহীনতা, ভালোবাসার মানুষের জন্য ক্লান্তিহীন অপেক্ষা, সব কিছু আমাদের ব্রেইনে ডোপামিন বা নর–পাইনেফ্রন আধিক্যের কারসাজি। কেমন হতো যদি জানা যায়, সারাক্ষণ প্রেমিক বা প্রেমিকার কথা ভাবা আসলে প্রেম নয়, ব্রেইনে সেরোটোনিনের ঝিম ধরা সাইড এফেক্ট? যদি আমি বের করতে পারতাম, ব্রেইনের ঠিক কোন অংশটা ভালোবাসার জন্ম দিচ্ছে বা কোন কেমিকাল ভালোবাসার অফুরন্ত প্রাণশক্তি জোগাচ্ছে, তাহলে হয়তো ভালোবাসার সংজ্ঞাই পাল্টে দিতে পারতাম।

প্রস্তুতি

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। একজন নিউরোসায়েন্টিস্ট–এর সঙ্গে আলাপের পর ঠিক করলাম যে, বিশেষ এক পরীক্ষা চালাবো। খুবই সাধারণ কিন্তু যা খুজছি তা হয়তো পেয়ে যাবো। পরীক্ষাটা হলো, একজন মানুষের ব্রেইনে *ফাংকশনাল ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং* (fMRI) করতে হবে দুই অবস্থায়। *এক.* যখন তার হাতে তার ভালোবাসার মানুষটির ছবি থাকবে। এবং *দুই.* অল্প পরিচিত একজন মানুষের ছবি হাতে। আমার পরীক্ষার যুক্তি ছিল একটিই, মানুষ যখন কোনো কিছু নিয়ে উত্তেজিত থাকে বা ভাবে তখন ব্রেইনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে কাজ করে। ভালোবাসার মানুষকে দেখে ব্রেইনের ঠিক কোন অংশগুলো অ্যাকটিভ হয়ে উঠছে, fMRI–এর মাধ্যমে তা ধরা পড়বে। আমার এক্সপেরিমেন্টে একজন নিউরোসায়েন্টিস্ট আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। এবং কয়েকদিন পরেই একজন রিসার্চ সাইকোলজিস্ট এবং দুজন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টও যোগ দিলেন। আমাদের ভয় ছিল একটি। হয়তো আমাদের সাবজেক্ট (যার ওপরে পরীক্ষা চালানো হবে) তার প্রিয় মানুষের ছবি দেখে এতোই আপ্লুত হবেন যে, দ্বিতীয় ছবি দেখানোর পর তার ব্রেইনে সে পরিবর্তন ধরা পড়বে না। এ জন্য দরকার ব্রেইনকে নিউট্রালাইজ করা। অনেক ভেবে ঠিক করা হলো প্রথম স্ক্যানিংয়ের পর সাবজেক্টকে একটি অনেক বড় সংখ্যা দেখিয়ে, উল্টো দিকে গুণতে বলা হবে। তাহলে তার মনে ভালো লাগার রেশ কমে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

এক্সপেরিমেন্ট

কিভাবে কাজ করবো সেটা ঠিক হওয়ার পর এখন সাবজেক্ট খোজার পালা। সবচেয়ে কঠিন কাজ। ঠিক করলাম বিজ্ঞাপন দেবো চারদিকে, *আপনি কি পাগলের মতো কাউকে ভালোবাসেন?* ভাগ্য ভালো যে পৃথিবীটা প্রেমিকে বোঝাই। অনেক অনেক উৎসাহী প্রেমিক পেলাম। কিন্তু সবাইকে নিয়ে তো আর এক্সপেরিমেন্ট করা সম্ভব নয়! তাই বাছা শুরু করলাম। প্রথমেই বাদ দেয়া হলো শরীরে মেটাল জাতীয় বা দাতে এনামেল ফিলিং রয়েছে এমন লোকদের। কারণ, fMRI মেশিন ধাতব পদার্থের উপস্থিতিতে ঠিকভাবে স্ক্যান করতে পারে না। বিভিন্ন রকমের ওষুধ ব্রেইনের ওপর নানানভাবে কাজ করে। ফলে সাবজেক্ট বেছে নেয়ার সময় কে কোন ওষুধ খাচ্ছেন তা জেনে নেয়া হলো এবং সে অনুযায়ীও কিছু লোক বাদ পড়লেন। এ রকম অনেক যাচাই-বাছাইয়ের পর পাওয়া গেল এক দল প্রেমপাগল মানুষ। সিলেকশনের পর আমরা তাদের বোঝালাম কি করতে যাচ্ছি এবং তাদের কি করতে হবে। সবার কাছ থেকেই আমরা তাদের ভালোবাসার মানুষটির ছবি এবং একই সঙ্গে অল্প চেনেন এমন একজনের ছবি নেয়া হলো। এবার শুরু হলো আসল পরীক্ষা।

ব্রেইন স্ক্যানিং

আমাদের প্রথম কাজ ছিল সাবজেক্টদের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া। fMRI মেশিনটি বেশ বড়সড়ো। তাই সাধারণ যে কেউ-ই প্রথমে ভয় পেতে পারেন। যাহোক, শুরু করলাম স্ক্যানিং। শুরুতেই একজন সাবজেক্টের প্রাথমিক স্ক্যানিং সেরে নিলাম। ব্রেইনের স্বাভাবিক এনাটমি বোঝার জন্য এটা করা। প্রাথমিক স্ক্যানিংয়ের পর সাবজেক্টকে ৩০ সেকেন্ড তার প্রিয় মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকতে বলা হলো। একই সময়ে তার ব্রেইন স্ক্যানিং করা হলো ব্রেইন সেল অ্যাকটিভিটি মনিটর করার জন্য। এ পর্যায়ে তাকে একটি বড় সংখ্যা দেখানো হলো এবং উল্টোদিকে গুণতে বললাম, ২০ সেকেন্ড ধরে। তারপর তাকে দেখানো হলো স্বল্প পরিচিত সেই লোকটির ছবি। এবং আবারও ৩০ সেকেন্ড ধরে তার ব্রেইন স্ক্যান করা হলো। এভাবে ছয় বারে ১৪৪টি ব্রেইন স্ক্যান ইমেজ নিলাম আমরা। স্ক্যানিং শেষ হওয়ার পর সাবজেক্টদের সঙ্গে আলাদাভাবে বসলাম উদ্দেশ্য হলো, এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে তাদের মতামত জানা।

ব্রেইনিক ভালোবাসা

ব্রেইন স্ক্যান ইমেজগুলো বোঝার জন্য বসলাম সবাই মিলে। ব্রেইনে রক্তের প্রবাহ বা ব্রেইন সেলগুলোর অ্যাকটিভিটি fMRI মেশিনের মাধ্যমে রেকর্ড করা যায়। কোন কোন ব্রেইন কেমিকাল কাজ করছে এটা সরাসরি বোঝা যায় না এই মেশিনে। কিন্তু যেহেতু ব্রেইনের এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের ব্রেইন কেমিকাল বেশি অ্যাকটিভ, তাই ওই ব্রেইনসেলগুলোর কাজের পরিমাণ বোঝা গেলেই আমরা বুঝতে পারবো যে, কোন ব্রেইন কেমিকাল কাজ করছে।

ইমেজগুলো দেখে বোঝা গেল যে, প্রিয় মানুষের ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেইনের অনেকগুলো অংশ কাজ করা শুরু করেছে। এর মধ্যে দুটো জায়গা ব্রেইনের একদম কেন্দ্রে। *কাউডেট নিউক্লিয়াস* নামের ব্রেইনের মাঝখানের এ অংশটিকেই আমাদের কাছে সবচেয়ে অ্যাকটিভ বলে মনে হলো। মজার কথা হলো, মানুষের ব্রেইনের এ অংশটুকু সবচেয়ে প্রাচীন। প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে থেকে যখন মানুষের বিবর্তন শুরু হয় তখনই মানুষের ব্রেইনে এ অংশটি রয়েছে। পরে মানুষের শারীরিক আকার-আকৃতি, স্বভাবের বিবর্তন ঘটলেও ব্রেইনের এই অংশটি পাল্টায়নি। ভালোবাসার মানুষকে দেখামাত্র এই অংশের হাইপার-অ্যাকটিভিটি আমাদের জন্য বেশ অবাক করা ব্যাপার।

এতোদিন আমরা ভাবতাম, ব্রেইন শুধু শারীরিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। মানসিক উত্তেজনায় যে এর ভূমিকা এতো বড় তা খুব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার জ্বলজ্বলে প্রমাণ *কাউডেট নিউক্লিয়াসের* অ্যাকটিভিটি।

আমাদের টিমের সাইকোলজিস্ট এক্সপেরিমেন্ট সাবজেক্টদের জন্য একটি সার্ভে ফরম তৈরি করেছিলেন। সাবজেক্টরা তাদের ভালোবাসায় কতোখানি আসক্ত তা বোঝার জন্য এটা করা হয়েছিল। মজার কথা হলো, যারা সার্ভে অনুযায়ী বেশি প্রেম আসক্ত তাদের *কাউডেট নিউক্লিয়াসও* বেশি অ্যাকটিভ। আরো একটি মজার জিনিস পেলাম আমরা। চকোলেট বা এ জাতীয় অ্যাডিকটিভ খাবার খেলে ব্রেইন সেলগুলো যে রকম আচরণ করে, প্রেমে পড়লেও মানুষের ব্রেইন সেল একই রকম আচরণ করে। এর থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ভালোবাসা নেশার মতোই।

ডোপামিন এবং ডোপামিন

আমার সব সময়ই মনে হতো ভালোবাসার সঙ্গে *ডোপামিন* নামের ব্রেইন কেমিকাল সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। fMRI-এর ফলাফল দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, ভালোবাসার মানুষকে দেখার পর ব্রেইনের *ভেন্ট্রাল টেগমেন্টাল এরিয়া* (VTA) নামের অংশটি বেশ সচল হয়ে ওঠে। এই VTA অংশটিই আমাদের ব্রেইনে ডোপামিন সাপ্লায়ার নামে পরিচিত। অর্থাৎ ভালো লাগার অনুভূতির সঙ্গে ব্রেইনে অতিরিক্ত ডোপামিন তৈরির একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

ভালোবাসা বড়ই জটিল

এতোদিন ভাবতাম ভালোবাসা মনের ব্যাপার। সেই সঙ্গে অনেকখানিই ভাগ্য জড়িত। কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্ট করার পর ভালোবাসা সম্পর্কে ধারণাই পাল্টে গেছে আমার। এক্সপেরিমেন্ট করার আগে ভালোবাসা সম্পর্কে দুটো মতামত ছিল আমাদের। *এক.* ভালোবাসা ডোপামিনের অ্যাকটিভিটির ফল মাত্র। এবং *দুই.* এটা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। আশ্চর্যজনক হলেও দুটো মতামতই সত্য। মনে কারো প্রতি অনুভূতির জন্ম নিলেই ভালোবাসার বীজ প্রোথিত হয় এবং ব্রেইনের ডোপামিন সেই বীজকে পরিণত করে মহান ভালোবাসায়।
আমাদের দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আমাদের মস্তিষ্ক বা ব্রেইন। শুধু শারীরিকভাবে নয়, আমাদের মানসিক অনুভূতিতেও সমানভাবে কাজ করে অঙ্গটি। তাই ভালোবাসা আজ খালি মানসিক ব্যাপার নয়। শরীর ও তার নিজস্ব ভাষায় তিল তিল করে গড়ে তোলে ভালোবাসা। হোক না নির্জীব কোনো ব্রেইন কেমিকাল। কিন্তু আমাদের ভালোবাসাকে সজীব করতে তাদের ভূমিকা অনেকখানিই রয়েছে।

উপকারী সেক্স

সুখী-বিবাহিত জীবন এবং নিয়মিত সেক্স একজন মানুষের আয়ু বাড়িয়ে দেয়। হার্ট কন্ডিশন ভালো করে, শরীরের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কিভাবে এতোগুলো ভালো কাজ শরীরে ঘটে তা বের করা বোধহয় একটু জটিল। যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে তবুও বিজ্ঞানীরা সবেমাত্র সেক্সের সঙ্গে এতোগুলো উপকারী ফলাফলের যোগসূত্র বের করার চেষ্টা করছেন।
অনেক গবেষণার পর *অক্সিটোসিন* নামের এক কেমিকালের দারুণ সব কাজকর্ম বের করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেক্সের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে এই কেমিকালটি। সাধারণত প্রসবের সময় যোনির প্রসারণে অক্সিটোসিন-র ভূমিকা জানতেন সবাই। গবেষণায় দেখা গেছে, অর্গাজমের সময় দেহে অক্সিটোসিনের পরিমাণ পাচগুণ বেশি বেড়ে যায়। অক্সিটোসিনের একটি অন্যতম কাজ হলো মানুষের মনে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করা। অক্সিটোসিন ব্রেইনে তৈরি হয় এবং রক্তের মাধ্যমে দেহে কাজ করে। শুধু এ পর্যন্তই নয় শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ, রক্তচাপসহ আরো অনেক কাজেই অক্সিটোসিন তার ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অক্সিটোসিনের উপকারী দিকগুলো বের হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা আরো ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সেক্সের সঙ্গে দেহের বায়োকেমিকাল উপাদানগুলোর যোগসূত্র বের করার। চলুন জানা যাক এখন পর্যন্ত কি জানতে পেরেছেন তারা।

হৃদয়ে হৃৎপিণ্ড

একবার সেক্স করলে দেহে প্রায় ২০০ ক্যালরি ক্ষয় হয়। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে জোরে হাটলে একই পরিমাণ ক্যালরি হারাই আমরা। তাই ব্যায়াম হিসেবে সেক্স সত্যিই অনন্য উপকারী। আর অর্গাজমের সময় হার্ট বিট এবং ব্লাডপ্রেশার দুই–ই বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। অক্সিটোসিনের প্রভাবেই এটা ঘটে। সুতরাং সবল হার্টের জন্য সেক্স বেশ উপকারী। যদিও বিজ্ঞানীরা সরাসরি সেক্সের সঙ্গে হার্টের সবল থাকার ব্যাপারটি মেনে নিতে রাজি নন। তবে ৮০–র দশকে এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছিল যে, যারা সপ্তাহে দুবার বা তারচেয়ে বেশি সেক্স করেন তাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা যারা মাসে কমপক্ষে একবার সেক্স করেন তাদের চেয়ে অর্ধেক। যদিও গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিজ্ঞানীরাই প্রশ্ন তুলেছিলেন। কারণ, যারা সেক্স বেশি করেন তারা যে তুলনামূলকভাবে সুস্থ দেহের অধিকারী হবে এটাই স্বাভাবিক। অতি সম্প্রতি সেক্সের সঙ্গে ডিহাইড্রোপিয়ানড্রোস্টোন (DHEA) এবং টেস্টোস্টেরন হরমোন দুটোর সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা চলছে। সেক্স ড্রাইভের সঙ্গে হরমোন দুটো সরাসরি সম্পর্কিত। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, হার্টের অসুখ এবং হার্ট মাসল সুস্থ রাখতে হরমোন দুটো বেশ কার্যকরী ভূমিকা রাখে। হয়তো এর জন্যই চিকিৎসকরা কারো হার্ট অ্যাটাকের পরেও সেক্স থামানোর পরামর্শ দেন না যদি না হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ হয়।

ব্যথা নিরাময়

সত্তরের দশকে ড. বেভারলি হুইপল নামে একজন বিজ্ঞানী নারী দেহে *জি–স্পট* নামে একটি স্থান নির্ণয় করেন। নারী দেহে সেক্স সংক্রান্ত উদ্দীপনা তৈরিতে জি–স্পটের ভূমিকা অনেক বেশি বলে ধারণা করা হয়। ড. হুইপল প্রমাণ করেন, জি–স্পটে হালকা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মহিলারা তাদের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা ৪০% পর্যন্ত বাড়াতে পারে। শুধু তাই নয়, অর্গাজমের সময় এই হার ১১০% পর্যন্ত হয়ে তাকে। *ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রিজনেন্স ইমেজিং* (fMRI) টেকনলজি ব্যবহার করে ড. হুইপল প্রমাণ করেন, ব্রেইনের একটি নির্দিষ্ট অংশ দেহের বিভিন্ন অংশে ব্যথা কমানোর জন্য সিগনাল পাঠায়। এই পেইন কিলিং সেন্টারটি সেক্সের সময় সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়। সেক্সের সময় ব্রেইনের এই অংশের নির্দেশে দেহে *এনডোরফিন* এবং *কর্টিকোস্টেরয়েড* নামের দুই কেমিকাল দেহে ব্যথা নিরাময়ে সাহায্য করে। তাই সেক্সের অনেকগুলো উপকারী দিকগুলোর একটি হলো শরীরের ব্যথা কমে যাওয়া।

রোগ প্রতিরোধে সেক্স

১৯৯৯ সালে ১০০জন কলেজ ছাত্রকে নিয়ে এক গবেষণা চালানো হয়। গবেষণায় দেখা যায়, এই ১০০জনের মধ্যে যারা সপ্তাহে কমপক্ষে একবার সেক্স করতেন তাদের দেহে রোগ প্রতিরোধকারী ইমুনোগ্লোবুলিন যারা সেক্স করতেন না তাদের চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ বেশি। এর ফলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশি।

বিজ্ঞানীরা এখন সেক্স আর কিভাবে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় তা বের করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এক্ষেত্রেও দেখা গেছে ম্যাজিক হরমোন অক্সিটোসিনের ভূমিকা। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, অক্সিটোসিন ইনজেকশন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণী দেহে ঘা শুকানোর সময় অর্ধেকে নেমে এসেছে। যদিও মানুষের ওপর এখনো এই পরীক্ষা চালানো হয়নি তবুও এই ফলাফল বেশ আশা ব্যঞ্জক।

সুখী সুদীর্ঘ জীবন

অবিবাহিতদের চেয়ে বিবাহিতরা যে দীর্ঘ সুখী জীবন কাটান তা সবাই জানেন। কিন্তু এটা কি সেক্সের জন্য, নাকি মনের মতো সঙ্গীর সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করার ফলাফল তা বোঝার উপায় নেই। ৩,৫০০ লোকের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে অবশ্য এটা বোঝা গেছে, রেগুলার সেক্স যারা করেন তারা একটু বেশি দিনই বাচেন। শুধু তাই নয়, এ ধরনের লোকদের মানসিক অস্থিরতা কমে থাকে। পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। যদিও বিজ্ঞানীরা সরাসরি সেক্সের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক পাননি তবুও সেক্স হরমোন অক্সিটোসিন, ইস্ট্রোজেন এবং টেস্টোস্টেরনের সমন্বয়ে এই উপকারী ফল পাওয়া যাচ্ছে তাতে সবাই মোটামুটি নিঃসন্দেহ। তাই সেক্সের আনন্দ নিয়ে আমরা যতোই মাতামাতি করি না কেন, সেক্সের উপকারিতা যে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী তা ধীরে ধীরে আমাদের সামনে ফুটে উঠছে।

হৃদরোগ

সেক্স হার্টের জন্য খুব ভালো ব্যায়াম। নিয়মিত সেক্সে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং হার্টের মাসল সুস্থ থাকে।

ওজন

প্রতিবার সেক্সে ২০০ ক্যালরি ক্ষয় হয়। তাই ওজন কমাতে ১৫ মিনিট দৌড়াদৌড়ির চেয়ে সেক্স অনেক বেশি আনন্দদায়ক।

ব্যথা

অর্গাজমের সময় এনডোরফিন নামে যে কেমিকাল আমাদের দেহে নিঃসৃত হয় তা শরীরের ব্যথা নিরাময়ে সাহায্য করে।

অবসাদগ্রস্ততা

যারা নিয়মিত সেক্স করেন তারা মানসিকভাবে অনেক বেশি উৎফুল্ল থাকেন এবং ফলে কম অবসন্নতায় ভোগেন।

দুশ্চিন্তা

সেক্সের সময় নিঃসৃত হরমোন আমাদের শরীরকে রিলাক্স করতে সাহায্য করে। ফলে মানসিকভাবে সহজেই চাঙ্গা হয়ে ওঠা যায়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

নিয়মিত পর্যাপ্ত সেক্স দেহে রোগ প্রতিরোধকারী উপাদানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।

ক্যান্সার

কিছু কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, অক্সিটোসিন এবং DHEA নামের সেক্স হরমোন দুটি ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

দীর্ঘ জীবন

নিয়মিত সেক্স এবং অর্গাজম যারা করেন তারা তুলনামূলকভাবে বেশি দিন বাচেন। সেক্সের ফলে সুস্থ হার্ট এবং অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হয়তো এই দীর্ঘ জীবনের জন্য দায়ী।

nac@littlebangla.com

শারীরিক অক্ষমতা বা সেক্সুয়াল ডিসফাংশন খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। এর সমাধান হিসেবে হাল আমলের ভায়াগ্রা থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক জিনসেং পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। নিচে এ ধরনের ওষুধগুলোর একটা লিস্ট দেয়া হলো।

পুরুষের জন্য :

- ভায়াগ্রা, লেভিট্রা এবং কিয়ালিস : পুরুষাঙ্গের রক্তবাহী নালী সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ ড্রাগগুলো কাজ করে। এ সম্প্রসারণের ফলে বেশি পরিমাণ রক্ত পুরুষাঙ্গে প্রবাহিত হয় এবং উত্থান দৃঢ় ও দীর্ঘ সময় ধরে হয়। ভায়াগ্রা ও লেভিট্রা চার পাচ ঘণ্টা কাজ করলেও কিয়ালিস–এর প্রতিক্রিয়া দেহে ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত দেখা গেছে।
- টেস্টোস্টেরন : যে সকল পুরুষ টেস্টোস্টেরন স্বল্পতায় ভোগেন তারা প্যাচ আকারে (অ্যান্ড্রোডার্ম, টেস্টোডার্ম) অথবা জেল আকারে (অ্যান্ড্রোজেল) ত্বকের মাধ্যমে বাড়তি টেস্টোস্টেরন নিয়ে থাকেন।
- আলপ্রোস্টাডিল : ইঞ্জেকশন (ক্যাভারজেক্ট)–এর মাধ্যমে পুরুষাঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। এর প্রয়োগে পুরুষদের রক্তবাহী নালীর সম্প্রসারণ ঘটে ফলে উত্তান দৃঢ় হয়।
- জিংকো বিলবোয়া : স্মৃতিবর্ধক হিসেবে পরিচিত এই ভেষজটি দেহে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে। পুরুষাঙ্গের দুর্বলতার চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত হলেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তুলনামূলকভাবে দুর্বল।
- জিনসেং : জিনসেং ব্যবহারে দেহে নাইট্রিক অক্সাইড নির্গত হয়। কিন্তু অক্ষমতার চিকিৎসায় এর ব্যবহার সীমিত।
- এল–আরজিনিন : এক ধরনের অ্যামিনো এসিড যা নাইট্রিক অক্সাইড তৈরির মাধ্যমে যৌনাঙ্গে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত করে।
- পেনাইল প্রোস্থেসিস : অপারেশনের মাধ্যমে পুরুষাঙ্গে স্থাপন করা হয়। যে সমস্ত পুরুষ ওষুধের মাধ্যমে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন না শুধু তারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

মহিলাদের জন্য :

- টেস্টোস্টেরন : লো ডোজে ব্যবহারের জন্য। প্যাচ এবং জেল আকারে ব্যবহার করা যায়।
- ইস্ট্রোজেন : ট্যাবলেট (ভেজিফেম) কৃম (এসট্রেস, ফিমারিন) এবং সিলিকন রিং (ফেমরিং) আকারে যৌনি পথে ব্যবহার করা যায়। মেনোপজের পর যৌনিপথের শুষ্কতার চিকিৎসায় ইস্ট্রোজেন ব্যবহৃত হয়।
- ভায়াগ্রা এবং লেভিট্রা : এখন পর্যন্ত মহিলাদের যৌন দুর্বলতার চিকিৎসায় এ দুটো ড্রাগের ব্যবহারে তেমন সফলতা আসেনি।
- অ্যাভিমিল : বিভিন্ন ভেষজের নির্যাস থেকে তৈরি এ ওষুধটি *ফিমেল ভায়াগ্রা* নামে পরিচিত। তেমন ফলাফল পাওয়া যায়নি।
- জেস্ট্রা : যৌনাঙ্গের স্পর্শকাতরতা বাড়ানোর জন্য এক ধরনের লোশন।
- এক্সজাইট : ভেষজ উপাদান থেকে তৈরি ক্যাপসুল। বহুল ব্যবহৃত না হলেও কিছু কিছু চিকিৎসক রোগীদের ওপর ব্যবহার করে সফলতা পেয়েছেন বলে দাবি করেন।
- স্লাইটেস্ট টাচ : একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস। ইলেকট্রোডের মাধ্যমে হালকা ভোল্টেজ পাস করে যৌনাঙ্গের নার্ভগুলো উত্তেজিত করা হয়।

ছোট বধূ মিষ্টি বধূ

– মোহাম্মদ কামরুজ্জামান মধু

বিয়ের আগে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নববধূকে দেখিনি।

গত দুই দিন হলো বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যেও বৌ দেখতে পারলাম না। মনটা ছটফট করতে লাগলো।

আমার স্ত্রীর নাম রেখা। যারা রেখাকে দেখেছে তাদের মধ্যে অন্তত দশজন আমাকে বললো, একদম ছোট, বাচ্চা মেয়ে, জেনে-শুনে কিভাবে বিয়ে করলি?

এক ভাবী বললেন, ওর বাবা-মায়েরই বা কেমন আক্কেল? একফোটা মেয়েকে পাঠিয়েছে স্বামীর ঘর করতে। সে কি জানে সংসার কি? স্বামী কাকে বলে? তার তো এখন পুতুল খেলার বয়স।

নানান মুখে নানান কথা শুনে রেখাকে দেখার ইচ্ছা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। কিন্তু তার কাছে সব সময় দুই চারজন লোক থাকায় লজ্জায় আর বৌ দেখা হলো না।

আরেক ভাবী বললেন, আজ তোদের বাসর রাত। বাসর হলেই বা কি? বাচ্চা মেয়ে, স্বামীর অধিকার সে কি বুঝবে?

বিয়ে হলো পৌষের ১৪ তারিখে।

বাসর হলো ১৬ তারিখে।

লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছি। রাত বারোটা বাজে। বাইরে শীত। ঘন কুয়াশা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভাবছি, বন্ধুরা কতো কি শিখিয়ে দিয়েছে, বৌ তো ছোট। সে কি বুঝবে আমার মনের কথা? আমি কি চাই?

দুই ভাবী উচু করে রেখাকে আমার ঘরে নিয়ে এলেন। একজন বললেন, ভাই আমার ননদ ছোট। কিছু বোঝে না। একটু সহ্য করেন।

আরেক ভাবী কানে কানে যা বললেন তা লেখা সম্ভব হলো না। তবে ফাটাফাটি একটা শব্দ ছিল।

ঘরে হারিকেনের আলো জ্বলছিল। রেখাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ছোটখাটো। তবে মুখ দেখা যাচ্ছিল না। ওর মুখটা দেখার খুব ইচ্ছা হলো। কিন্তু সাহস পেলাম না। ছোট মেয়ে, কি না কি ভেবে বসে এই ভয়ে।

হঠাৎ দপ করে হারিকেন নিভিয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে শুয়ে পড়লো রেখা। বুঝলাম অধিকার আদায়ে সে খুব সচেতন। লেপ ঠিকমতো টেনে নিয়েছে যাতে লেপ তার ভাগে কম না পড়ে। লেপ টানাটানিতে তার শরীর আমার সঙ্গে কয়েকবার স্পর্শ করলো।

আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। জীবনে এই প্রথম কোনো মেয়ের সঙ্গে টাস খাওয়া। কিভাবে তার সঙ্গে কথা শুরু করবো ভাবতে লাগলাম। ভাবনার ছেদ পড়লো তার কনুইয়ের খোচা খেয়ে। কিছু বলার আগেই আরেক খোচা।

কটমট করে তাকালাম।

কিছু বলার আগেই বললো, যে মাগির সঙ্গে প্রেম করেছিলে তাকে বিয়ে করলে না কেন?

তার কথা শুনে অবাক হলাম। ঝটপট করে সে কথা বলে। একটুও জড়তা নেই।

বললো, কথা বলছো না কেন? কথা বলার মুখ থাকলে তো বলবে? প্রেম করবে, বিয়ে করবে না। মজা করার জন্য প্রেম করো। তাই না?

বললাম, কার কাছ থেকে এসব শুনেছো? যে প্রেম করেছি বলেছে সে মিথ্যা বলেছে। আমি কারো সঙ্গে প্রেম করিনি।

সত্য কথা বলতেও সাহস লাগে। যার সঙ্গে তুমি প্রেম করেছো তার নাম রেহানা। তুমি বিয়ে করতে চেয়েছিলে, তোমার মা-ভাই রাজি হয়নি। তাতে কি? রেহানাকে টেনে হেচড়ে কাজি অফিসে নিয়ে যেতে। বিয়ে করে বাড়ি এনে বলতে, আমার বিয়ে আমি করেছি, যাকে খুশি তাকে করেছি।

যাক, বিয়ে যখন করোনি, ভবিষ্যতে ওই মাগির সঙ্গে কথা বলারও দরকার নেই। যদি কোনোদিন শুনি তার সঙ্গে কথা বলেছো তবে আমি ওই মাগির চুল ছিড়ে শাক রাধবো। বুঝেছো? এবার আমি ঘুমাবো। ভোর পাচটায় আমাকে জাগিয়ে দেবে। দেরি করে ঘুম থেকে উঠলে মানুষের সামনে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা লাগবে। আর একটি কথা। কারো হাত পা আমার গায়ে পড়লে আমার ঠিকমতো ঘুম হয় না। তাই সাবধানে শোবে যাতে তোমার হাত পা আমার গায়ে না পড়ে। ভাবী কি বলেছে তা মনে আছে তো? ভাবী বলেছে, আমি ছোট। কিছু বুঝি না। কথাটা মনে রেখো। আমি এতোক্ষণ যা যা বলেছি সব মন দিয়ে শুনেছো তো? নাকি একটা তাল গাছের সঙ্গে বক বক করলাম?

বললাম, সব মন দিয়ে শুনেছি।

শুনলে তো ভালোই। বলেই সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো।

হায় আল্লাহ! কার সঙ্গে তুমি আমায় জুড়ি করলে? বাসর রাতে নাকি স্বামীরা বিড়াল মারে। এখানে নতুন বৌ তো আমাকে থ্যাৎলা করে দিল।

ভাবতে ভাবতে আধা ঘন্টা পার হয়ে গেল। প্রচণ্ড শীতেও আমার গা যেন ঘামছিল।

বাইরে এসে সিগারেট ধরালাম। ভাবছি রেহানার সঙ্গে বিয়ে হলে এতোক্ষণ এক বালিশে দুজন শুয়ে থাকতাম। হারিয়ে যেতাম একে অন্যের মাঝে। হঠাৎ কে যেন আমার কাধে হাত রাখলো।

তাকিয়ে দেখি রেখা।

ঘরে চলো, ঠাণ্ডা লাগবে। আমি জানি, তুমি কেন বাইরে এসেছো।

কেন?

সিগারেট খেতে। আর সিগারেট খেতে খেতে কি ভাবছিলে তাও আমি জানি।

কি জানো?

তুমি রেহানার কথা ভাবছিলে। আমি তোমাকে বকাঝকা করেছি। সে হলে আদর করতো, খারাপ ব্যবহার করতো না।

তার পিছু পিছু ঘরে গেলাম।

ঘরে এসে বললো, হারিকেনটা জ্বালাও। হারিকেন জ্বালিয়ে পেছন ফিরে তাকাতে দেখি ঘোমটা ফেলে নিচের দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে আছে রেখা।

তাকে দেখে অবাক হলাম। এতো সুন্দর সে! খাড়া নাক, ভাসা ভাসা বড় বড় দুটো চোখ, লম্বা চুল, শ্যামলা রঙ।

আল্লাহর কাছে হাজারও শুকরিয়া আদায় করলাম এতো সুন্দর পুতুলের মতো একটা বৌ পাওয়ার জন্য।

খুবই নম্রভাবে নিচের দিকে তাকিয়ে সে বললো, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে?

যার কথার এতো ধার, বলা যায় ঠোট কাটা, তার মুখের ভাষা এতো নরম হতে পারে? আবারও অবাক হলাম।

সে বললো, কিছু বলছো না কেন? হ্যা, না একটা কিছু বলো?

বললাম, উপরে আল্লাহ, নিচে মাটি। তাদের কসম দিয়ে বলছি, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তোমার নাক, মুখ, চোখ, লম্বা চুল খুব সুন্দর। আমি ভাগ্যবান। তাই তো তোমার মতো বৌ পেয়েছি।

আমাকে জড়িয়ে ধরলো রেখা।

তার চোখ ছল ছল করছে। বললো, তুমি একটা পাগল। আজ রাতে কতো কথা আমি বললাম, তুমি একটা কথাও বললে না। তোমার কথা যে আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছিল।

বললাম, তোমার কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছিল। তাই শুধু শুনেছি, কিছু বলিনি। সারা জনম, তুমি বলবে, আমি শুনবো।

কেদে ফেললো রেখা।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, অধৈর্য হয়ো না। তোমার কাছে কিছু সময় চাই। বিশ্বাস করো, আমি এখনো সাবালিকা হইনি। পারবে না কিছু সময় আমাকে দিতে? তোমার খুব কষ্ট হবে, তাই না?

এক ঘণ্টা আগে মনে হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন মেয়ে রেখা।

এখন মনে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে মায়া-মমতায় ভরা তার মন।

তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললাম, কোনোদিন, কোনো সময় এমন কিছু করবো না যাতে তোমার চোখ থেকে এক ফোটা পানি পড়ে।

বারো বছরের রেখা আর বাইশ বছরের এই আমি সারা রাত গল্প করে কাটিয়েছিলাম। এক মিনিটও ঘুমাইনি আমরা। সেই ছোট রেখা ও আমি ওই রাতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছিলাম ভালোবাসার জীবন সংসারে। ওই ঠোট কাটা স্বভাবের চঞ্চল কিন্তু লক্ষ্মী মেয়েটিকে নিয়ে তারপর দীর্ঘ বারো বছর সংসার করেছি মহা সুখে। দুটি সন্তান হয়েছে আমাদের চাদের মতো ফুটফুটে। মেয়েটির বয়স ছয়, ছেলের বয়স তিন।

রেখার অনুমতি ছাড়া গোপনে বাসর রাতের গোপন কথা লিখলাম। যদি লেখাটি সে পড়ে ফেলে তাহলে তাকে বলবো, এর জন্য সে সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা কথা না বলার শাস্তি আমায় দিতে পারে।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

অবহেলিত

আমি এক গ্রামের অবহেলিত গৃহবধূ।

মেয়েদের জীবনে অনিবার্য কারণে যেভাবে প্রেম ভালোবাসা আসে তেমন আমার জীবনেও এসেছিল বাধ ভাঙা ভালোবাসার জোয়ার। তবে সেটিকে ভালোবাসা বলা যায় কি না তা ঠিক বলতে পারবো না। লোকের মুখে শুনেছি, ভালোবাসা সার্থক করার জন্য নাকি অনেক কষ্ট করতে হয়। প্রিয়তম বা প্রিয়তমার মুখটি দেখার জন্য অনেক কষ্টের সমুদ্রও পাড়ি দিতে হয়।

আমার ভালোবাসাটি ছিল নেহায়েত শাদামাটা। তারুণ্যের সতত উচ্ছলতার মতো ছুটে চলা এক বাধ ভাঙা বন্যার মতো ছিল আমার ভালোবাসা। ভালোবেসেছিলাম আমার এক গৃহশিক্ষককে। সেও ভালোবাসতো আমাকে। সবার অলক্ষ্যে সে দিনে আমাকে অন্তত বত্রিশটি চুমু উপহার দিতো কপাল, চোখ, মুখ ও বুকে।

তার এ আচরণে কোনোদিন না করতে পারিনি। কেননা তাকে ভালোবাসতাম মন-প্রাণ দিয়ে। আমি যখন কৈশোর পেরিয়ে নারীত্বের মর্যাদায় সমাসীন হয়েছিলাম সেদিন স্কুলের ক্লাসেই ছিলাম। পরে তাৎক্ষণিক ক্লাস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিলাম বাড়ি। ফিরে এসেই দেখেছিলাম আমার গৃহশিক্ষককে। তার মুখটি সেদিন থেকেই আমার হৃদয়পটে আকা ছিল। লাজে, শরমে বলতে পারিনি আমি তাকে ভালোবাসি। পরে সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমরা এসেছিলাম একে অপরের একান্ত কাছে।

যাকে আমি চেয়েছিলাম তাকে পাইনি। বাদ সাধে আমার নিয়তি। এখন আমার ঘর-সংসার এক গন্ডগ্রামের এক অসচ্ছল পরিবারে। আমার বিবাহিত স্বামীকে স্বামী না বলে অন্য কিছু বললে হয়তো তার পরিচয় পাওয়া যেতো। কিন্তু বাঙালি গৃহবধূর মুখে নাকি স্বামীর অবমাননা সূচক কিছুই মানায় না। তাই স্বামীর মুখোশ উন্মোচনে আমার সামনে তেমন কোনো হাতিয়ার নেই। তবে তার যে চরিত্রটির কথা বলবো তা হলো, সে এক রসহীন, প্রেমহীন কাঠ। সে একজন মেয়েকে কিভাবে সন্তানের মা করতে হয় তা জানে বটে। প্রকৃত ভালোবাসা সে জানে না। যাকে ভালোবাসতাম সে এক কথায় সব জানতো। আদর, সোহাগ দিয়ে আমাকে

কিভাবে উত্তেজিত করতে হতো তা তার সবই জানা ছিল। হায়! তাকে জীবন সঙ্গী করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আমার বিয়েটি হয়েছিল এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে। আমাকে জোর করে যখন বিয়ে দেয়ার সব আয়োজন চলছিল তখন আমার প্রিয়তম আমাদের পরিবার থেকে ছিল অনেক দূরে। আমার এক *বিড়াল তপস্বী* দুলাভাইয়ের কারণে সে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আমাদের পরিবারে দুলাভাইয়ের স্বার্থপরের আচরণ আমার প্রাণের মানুষটি সহ্য করতে পারেনি। স্বার্থপর দুলাভাইয়ের কোপানলে পড়েছিল সে।

আমরা দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমাদের দুজনের মধ্যে কথা ছিল, মরতে হলে দুজনেই এক সঙ্গে মরবো। পালিয়ে গিয়ে হলেও বিয়ে করবো। বাধবো দুজনে সুখের ঘর। হারিয়ে যাবো দুজনে স্বপ্ন তারার রাজ্যে।

কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি।

যাকে নিয়ে বর্তমানে সংসার করছি সে কামুক টাইপের এবং বয়সের ভারে ঢলে পড়া এক অপদার্থ। আমি যখন আমার প্রিয়তমের ব্যথায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সে সময় আমার এক দূরসম্পর্কীয় চাচা তাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। চাচার সঙ্গে আসা লোকটিকে দেখতে আরেক *গেদুচাচার* মতো মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু আমার মা কোনো এক কারণে তাকে পছন্দ করেছিলেন। পিতা হারা পরিবারে সে সময় আমার পরিবার জুড়ে অভাব আর হাহাকার অবস্থা। সুতরাং আমাকে পাত্রস্থ করতে পারলেই পরিবারের একটি বোঝা যেন ঘাড় থেকে নেমে যায়।

আমার বিয়ের তারিখ ধার্য হলো। আমার প্রিয়তমের সঙ্গে আমার ভালোবাসার বিষয়টি এক কান, দুই কান করে সর্বত্র রটে যায়। আমার হবু বর জানতো, আমি আমার নারীত্ব অনেক আগেই আমার প্রিয়তমের কাছে দিয়েছিলাম। বিলিয়ে দিয়েছিলাম আমার যৌবন ও মন আমার প্রিয়তমের কাছে।

আমাকে বিয়ের গাড়িতে তুলে দিল সবাই। সেদিন অনেক কেদেছিলাম। আমার সে কান্না কেউ বোঝেনি। সবাই বুঝেছিল, বাপের বাড়ি থেকে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় সবাই এ ধরনের কান্না করে। কিন্তু আমার কান্নাটি এ কারণেই যতোটা ছিল তারচেয়ে বেশি ছিল আমার প্রাণসখার জন্য।

যাহোক, আমি যাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম সে এখন আমার নেই। আমি এখন বিষণ্ণ মনে দিন কাটাই একটি গ্রামের নীরস এক ঘরে যেখানে নেই কোনো ভালোবাসার উপকরণ। এখন আমি প্রকৃতির নিয়মে একের পর এক সন্তান জন্ম দিয়ে চলেছি। উপায় নেই। আমার স্বামী কামুক। তাই আমাকে বিছানায় যেতে হয়। দুই পা ছড়িয়ে পড়ে থাকি মাত্র। স্বামী আমার সুখ-দুঃখ খেয়াল করে না। সে ইচ্ছা মতো তার কাম চরিতার্থ করে এক সময় আমার ওপর থেকে নেমে যায়। এভাবে আমি হয়ে যাই সন্তানসম্ভবা।

এখন আমার বড় ছেলে নূরানী শিক্ষায় যায়। আমার স্বামী জানে না এই সন্তানটি কার। সে হয়তো জানবেও না আমি প্রকৃতই কি চাই আর কি দেয় সে আমাকে?

আমার প্রিয়তমের বাড়ি আর আমার শ্বশুরবাড়ি একটি নদীর এপার-ওপার মাত্র। তাই মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে আমার দেখাও হচ্ছে ইদানীং।

একদিন আমার সে প্রিয়তমের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে সেদিন অনেক কথা হয়েছিল। তখনো বলেছিল, সে আমাকে ভোলেনি। তখন আমার দুই চোখে অঝোর ধারায় অশ্রুবন্যা বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার পক্ষে এখন আর কিছু করা সম্ভব নয়। তবে প্রিয়তমের জন্য আমার দরজা খোলা থাকবে যতোদিন বাচি। আর যতো সন্তানের মা হচ্ছি, আমি ভেবে নিচ্ছি, এসব সন্তানের প্রকৃত পিতা সে। তাকে বলি, তুমি সুখে থেকো। তুমি অন্য একজনকে বিয়ে করে সুখী হও।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বিচ্ছিন্ন

– মুহাম্মদ আতিকুল কবীর

কিছু দিন আগে শমরিতা হসপিটালে এক রোগীকে দেখলাম। রোড একসিডেন্টের পর তার ডান হাত কনুই থেকে নিচের অংশ কেটে ফেলতে হয়েছে। হাত কাটার কয়েকদিন পর তার এক অদ্ভুত সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার মনে হয় যে, তার ডান হাতের তলায় চুলকায়। একটু চুলকিয়ে দিলে হয়তো আরাম হতো। কিন্তু তার ওই অংশটাই যে নেই। এটা বোঝার পর তার হাত ছোয়ার ইচ্ছা আরো বেড়ে যায়। মাথার ভেতর অনুভূতিগুলো জট পাকিয়ে ফেলে। অস্থির এক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে সে। আজন্ম সঙ্গী শরীরের কোনো অংশ হঠাৎ এভাবে বিচ্ছিন্ন হলে এ রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডাক্তারি ভাষায় এর একটি নামও আছে।

ওই রোগীর মতো ইদানীং আমারও এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমার সাত বছরের সঙ্গিনী তার মা–বাবার একঘেয়েমির ভুল সার্জারিতে আজ আমার থেকে বিচ্ছিন্ন। ভালো লাগা সে আজ অন্যের ঘরনী। কিন্তু এ সত্য মাঝে মধ্যে ভুলে যাই। এ রকম যে হতে পারে তা আমাদের দুজনের কল্পনাতেও ছিল না, ছিল অবিশ্বাস্য। এখনো তাকে আমার ছুতে ইচ্ছা করে, আদর করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে তো আমার ধরাছোয়ার বাইরে। এই কঠিন বাস্তবতার উপলব্ধি আমাকে আরো অস্থির করে তোলে। জট পাকিয়ে যায় আমার চিন্তা। রোগীটি যখন তার হাত ছুতে চাচ্ছে তখন তার হাত হয়তো হাসপাতালের কাছের ডাস্টবিন নিংড়ানো কোনো কুকুলের দখলে। এখন আমার রানী যে কার দখলে তা আজও জানি না।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

সেই লাল গোলাপ

– নাজমুস সাকিব

লেকের পাড়ে বসে সিগারেটটা ধরাতে গিয়েও ধরালো না সাকিব। নাহ্‌, ধরানো ঠিক হবে না। যে কোনো সময় নিটোল এসে পড়তে পারে। নিটোল তার সিগারেট খাওয়াটা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দেখলে খুব মাইন্ড করবে। কথাই হয়তো বলবে না। উহু, আজ সাকিবকে কথা বলতেই হবে। সব কিছু মনের সব কথা। পেছনের দিনগুলোতে যখনই সে এসব বলতে চেয়েছে কেন যেন পারেনি। অজানা কারণে। কিন্তু আজ পারতেই হবে এই ভালোবাসার দিনে। দিতে হবে এই গোলাপটা। লাল গোলাপ। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে ও গোলাপটা।

হাই সাকিব।

পেছন থেকে ডাক শোনা যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় সে। নিটোলকে দেখতে পায়। খুব সুন্দর লাগছে নিটোলকে। নীল রঙের, হালকা নীল, একটা শার্ট, সঙ্গে জিন্স। এমনিতে অপূর্ব সুন্দর নিটোল। আজ অসাধারণ লাগছে। হা করে চেয়ে রইলো সাকিব।

তাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে কিছুটা অবাক হয় নিটোল। মিষ্টি হেসে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার, দার্শনিক হয়ে গেছো নাকি আজ? নাকি আমাকে চিনতে পারছো না? কোনটা?

নিটোলের কথায় বাস্তবে ফিরে আসে সাকিব। বলে, তোমাকে আজ এতো সুন্দর লাগছে না, উফ! সত্যি কি বলবো আমি।

হয়েছে, আর বলতে হবে না। পটাতে ভালোই পারো।

না, সত্যি। আচ্ছা হয়েছে। আপনার পাশে কি একটু বসতে পারি মিস্টার।

ইশ! এখন যে তুমি ন্যাকামো করছো! প্লিজ, বসো।

সাকিবের পাশে বসে পড়ে নিটোল।

সাকিব আস্তে করে গোলাপটা এগিয়ে দিলে বলে, হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে।
থ্যাংক ইউ। হেসে গোলাপটা হাতে নেয় নিটোল। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে ফুলটার দিকে।
সাকিব নিটোলকে প্রশ্ন করে, ফুলটা তোমার পছন্দ হয়েছে?
অবাক হয় নিটোল। বাহ! পছন্দ হবে না কেন? কি সুন্দর আর কি বড়!
সাকিব কিছুটা ইতস্তত করে। তারপর বলে, আচ্ছা নিটোল, আমাকে তোমার কেমন লাগে?
খুবই জঘন্য।
না, আমি সিরিয়াস। প্লিজ বলো না।
এবার তার দিকে ফিরে তাকায় নিটোল। বলে, তোমার মতো হ্যান্ডসাম ছেলেকে পছন্দ না করে কেউ পারে?
ইয়ে, একটা কথা বলি নিটোল।
বলো।
তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?
তুমি কি বলতে চাচ্ছো, আমি বুঝতে পারছি না।
সরাসরি নিটোলের চোখের দিকে তাকায় সাকিব। আমি জানি, তুমি ঠিকই বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাচ্ছি। Do you love me? ডু ইউ লাভ মি?
দেখো সাকিব, আমি তোমাকে এভাবে কখনোই ভাবিনি। তুমি আমার ভালো বন্ধু।
কিন্তু আমরা কি আমাদের এই বন্ধুত্বটাকে ভালোবাসার রূপ দিতে পারি না? সাকিব ব্যগ্রভাবে জানতে চায়।
আমি জানি সাকিব, এরপর কি হবে। তুমি চাইবে আমাদের সম্পর্কটা বিয়ে পর্যন্ত গড়াতো, তাই না?
হ্যা, তাই তো হয়।
কিন্তু আমি মানে আমার বিয়ের কথা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে।
সাকিব শুধু চুপ হয়ে কথাটা শুনলো। কিছু বললো না।
নিটোলই বলে উঠলো, সাকিব, আমি চলে যাচ্ছি। বাসায় ফোন করো। আসি।
সাকিব কিছুই বললো না।
পাশ ফিরে চাইলো সাকিব।
নিটোল চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।
হঠাৎ মাটির দিকে চোখ পড়লো তার।
নিটোল ওটা ফেলে গেছে।
তার দেয়া সেই লাল গোলাপটা।

ঢাকা থেকে

কৌশল

- নাজমুল হাসান

কলেজ ছুটি হয়ে গেল। প্রতীক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়ে নিশু তার হাস্যময় মুখে উপস্থিত হলো আমার সামনে। বান্ধবীদের বিদায় জানিয়ে পাশাপাশি হাটতে লাগলো আর অবিরাম বক বক, বক বক।
শোন, আজকে আমাদের ক্লাসের রিজন ছেলেটাকে ইংলিশের টিচার কানে ধরিয়েছেন। খুব খুশি হয়েছি। যা ফাজিল ছেলে।
কিংবা আল্লাহ আজকে বাংলার যে নতুন টিচারটা এসেছে তিনি আমাকে দাড় করিয়েছিলেন। আমার তো ভয়ে...! হিঃ হিঃ।

আমার কানে কিছুই ঢুকছে না। কেবল চিন্তা করে যাচ্ছি। কয়দিন পরেই টেস্ট পরীক্ষা। তারপর তিন চার মাস বন্ধ, এরপরে এইচএসসি পরীক্ষা। আবার বন্ধ। এতো বিশাল সময় নিশুকে না দেখে থাকবো কিভাবে? পড়াশোনা গোল্লায় যাচ্ছে নিশুর চিন্তায়। তার উপর এতো বিশাল সময় দেখা হবে না। দেখা না হলে কথা হবে না। কথা না হলে যদি সম্পর্কটা হাল্কা হয়ে যায়! অথচ নিশুকে কথাটা বলে ফেললেই সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি।

সাহসে কুলায় না। নিশুর দিকে তাকাই। চোখের মধ্যে কিছু লেখা আছে কি না পড়তে চেষ্টা করি, পারি না। কোনো লেখাই দেখতে পাই না। কিন্তু নিশুকে যে কথাটা বলে ফেলা দরকার! আল্লাহ সাহায্য করো। ইস। কথাটা যদি নিশু বলতো আমি কখনোই রিফিউজ করতাম না। তবে নিশু যদি রিফিউজ করে! দুশ্চিন্তার পাশাপাশি ভয়ও খেলা করে।

কমার্স কলেজ থেকে শেখ মুজিব রোড পর্যন্তই নিশুর সঙ্গ পাওয়া যায়। তারপর নিশু রিকশায়, আমি হন্টন।

আহা, রাস্তাটা যে শেষ হয়ে গেল! এখনই নিশু রিকশা নিয়ে চলে যাবে, অথচ আমি এখনো কথাটা বলতে পারবো না।

কি ব্যাপার, কথা বলছো না যে! নিশুর কথায়ই চমক ভাঙলো।

নিশু, তোমার সম্পর্কে একজন আমাকে একটা কথা বলেছে।

কে?

কে সেটা তো বলবো না, তুমি জিজ্ঞাসাও করো না। কিন্তু তুমি কি শতকরা একশ ভাগ সত্যি উত্তর দেবে? আমি বেশ মরিয়া হয়ে প্রশ্ন রাখলাম।

অব্যশ্যই দেবো। কি ব্যাপার?

কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। গুছিয়ে নিলাম কথাগুলো।

শুনলাম, তুমি নাকি আমার প্রেমে পড়েছো? আই মিন আমাকে ভালোবাসো?

হড়বড় করে বলা কথাগুলো শুনে নিশু থমকে গেল। তারপরেই নিশুর মধ্যে কি জানি পরিবর্তন ঘটে গেল। তার বর্ণনায় আমি অক্ষম।

নিশু প্রথমে মাথা নিচু করলো। তারপর দ্রুত কয়েকবার উপর-নিচ করলো, হু।

ওয়াও! থ্যাংকস নিশু। থ্যাংকস গড। না, না আল্লাহ। আমিও বাসি নিশু, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

সেদিন আমরা প্রায় আড়াই ঘণ্টা একত্রে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।

তারপর দীর্ঘ চার বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু সত্যি বলছি, আমাদের সম্পর্ক একটুও হাল্কা হয়নি।

গত মাসে আক্দ হয়ে যাবার পর এতোদিন যে বিষয়টা সযত্নে গোপন রেখেছিলাম ঠিক সেটা সম্পর্কেই জানতে চাইলো নিশু, চুপি চুপি। আচ্ছা, আমি যে তোমাকে ভালোবাসি কথাটা কে বলেছিল? আমি তো কাউকেই বলিনি।

আমি হাসলাম, নাজমুল বলেছিল।

কোন নাজমুল?

তোমার হাজব্যান্ড, তোমার পাশে দণ্ডায়মান।

মানে?

মানে হল গিয়ে, তোমাকে বলতেও পারছিলাম না আবার সইতেও পারছিলাম না। তাই তোমার মুখ থেকেই আদায় করে নিলাম।

উহ্ কি বুদ্ধি! পিঠে ছোট্ট কিল বসিয়ে দিল আমার নিশু।

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

শেষ প্রেম

– জি. নেওয়াজ খান

সবাই বলে আমার চোখ দুটো নাকি ভারী সুন্দর। আয়নায় নিজে দেখেও খারাপ লাগেনা। মনে মনে বলি, সুন্দরই তো! আমার কাঠিকাঠি শরীর দেখে না হলেও, চোখ দুটোর প্রেমে যে অনেক মেয়েই পড়েছে তা বুঝতে পারি।

এ প্রেম ঘটনার সূত্রপাত সেই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি। তখন আমি এইচএসসির ছাত্র। মানিকগঞ্জ জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে আমার বড় বোনের শ্বশুরবাড়ি। আমার বড় খালার বাড়ি ওই একই গ্রামে।

আমার খালাতো ভাইয়ের বিয়ে। আমরাসহ বোনের বাড়ির সবাই বিয়ে বাড়িতে। বোনের বাড়ি সাধারণত চুপচাপ। বিয়ে বাড়িতে দেখলাম একটা মেয়েকে। স্কুলের উপরের দিকের ছাত্রী। নামের আদ্য অক্ষর ছ। শ্যামলা হলেও মিঠা মেয়ে। মনে হলো আমার চোখ দুটো তার মনে রঙ ধরিয়েছে। প্রায় রোজই বোনের জনমানবহীন ফাকা বাড়িতে চলতে লাগলো আলাপ, আড্ডার প্রাণ কেন্দ্র হয়ে।

এর মধ্যে কানে এলো আমি নাকি মেয়ের বাবা–মায়ের মনেও দোলা দিয়েছি। তারা আমার বাবা–মায়ের কাছে কোনো রকম রাখ–ঢাক না করেই সরাসরি বিয়ের প্রস্তাবই দিয়ে দিল। কিন্তু বাবা–মা বংশ মর্যাদার আবেশে, আমার পড়ালেখার মাত্র শুরু পর্যায়ের কথা তুলে ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিল।

আমিও মনে মনে খুশিই হলাম। কারণ এর মধ্যেই ঢাকায় স্কুলের মধ্যম পর্যায়ে পড়ুয়া এক মেয়ের প্রেমে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। তবে শেষ পর্যন্ত সামাজিক এবং আমার বাবা–মায়ের বংশের কোনো মর্যাদা রাখতে পারিনি। আমার জীবনের সর্বপ্রথম এই নিরেট–নিখাদ প্রেমের মানবীই এখন আমার সমগ্র জীবন জুড়ে গৃহিণী ও পরম হিতৈষিণী।

এ জীবনে শুধু প্রেম নয়, আরো অনেক নারীর কাছ থেকেই সম্ভোগের প্রস্তাব ও আবেদন পেয়েছি। কিন্তু তা অটুট মনোবল দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছি। এ শক্তিও পেয়েছি আমার প্রেয়সীর কাছ থেকেই।

আমার শুধু মনে হয়েছে, তাকে প্রতারণা করতে পারবো না। আমার পদস্খলনে তারও পদস্খলন অনিবার্য। আল্লাহ আমাকে এর প্রতিদান দিয়েছে। বিয়ের পর অনেক দিক দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রমাণ পিয়েছি।

কুল ও মর্যাদায় উন্নাসিক আমার বাবা–মা বিয়ের প্রথম দিকে বিরুদ্ধাচরণ করলেও বিয়ের পর মা প্রথম বললেন, আমার একমাত্র ছেলের বৌ বড় লক্ষ্মী ও পয়মন্ত।

আর ছেলের বৌকে প্রাণভরে মা ডাকেই সম্বোধিত করেছেন বাবা। তাদের একমাত্র ছেলের বৌ–ও দেহ–মন সম্পূর্ণ উজাড় করে আমৃত্যু শ্বশুর–শাশুড়ির সেবা–যত্ন করেছেন।

এবার আমার একান্ত ব্যক্তিগত কিছু কথা বলে নিই। বয়স এখন প্রায় সত্তর ছুই ছুই। কঠিন হৃদরোগের চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় সুযোগ্য ও কর্তব্যপরায়ণ ডাক্তারের সামান্য অবহেলার কারণে আজ আমি পক্ষঘাতগ্রস্ত। শরীরের বামপাশ সম্পূর্ণ অবশ।

তা প্রায় আধা শতাব্দী পরে হঠাৎ এক নারী কণ্ঠের টেলিফোন।

আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, চিনতে পারছেন।

ওয়ালাইকুম আসসালাম, না তো।

আমি বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার অমুক গ্রামের ছ। আরে তুমি? আমার টেলিফোন নাম্বার কোথায় পেলে? শুধু চমকে উঠলাম না, খুশিও হলাম।

আপনার এক ভাগ্নের কাছে। সে আপনার বড় বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানেই দেখা। আপনার শারীরিক অসুস্থতার কথা শুনে আপনাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছি। দয়া করে আপনি আরেকবার

আপনার বাসার লোকেশন ও ঠিকানা দিন। যদিও আপনার ভাগ্নের কাছ থেকে সবই নিয়েছি। আপনার কাছ থেকে পেলে কনফার্মড হতে পারবো।

খুশি হয়ে ঠিকানা-লোকেশন দিলাম।

নির্দিষ্ট দিন ও সঠিক সময়ে ছ এসে হাজির। সেই কবেকার কথা। চেহারাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। দেখলাম একটা মায়াবী মুখ। তবে *মেমসাব* মার্কা চুল কাটিং। আমাকে দেখে তার চোখ ছলছল করে উঠলো। একটা সুন্দর দামি হ্যান্ডব্যাগে তার হাত ঢোকানো।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছো, কোথায় আছো, ছেলেমেয়ে কয়জন, তাদের আব্বা কি করে? এক নিঃশ্বাসে সবগুলো প্রশ্ন করে ফেললাম।

চোখ দুটো মুছে প্রথমেই বললো, ভাইজান, শরীরটা আল্লাহ বিধ্বস্ত করলেও আপনার চোখ দুটো সেই রকমই আছে।

এরপর একটা একটা করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলো।

আল্লাহ ভালো রেখেছেন। পরিবারিক ও সামাজিক দিক থেকে বেশ প্রাচুর্যের মধ্যেই আছি। স্বামী আইনজীবী সার্টিফিকেটধারী হলেও ব্যবসায়ী। থাকি চট্টগ্রাম। একটা মাত্র মেয়ে। জাপানে কমপিউটার সায়েন্সে এম.এস করছে। বাচ্চাটা সিজারিয়ান হয়েছে। আগে থেকেই ইউটেরাস জনিত কিছু জটিলতায় ভুগছিলাম। তাই ডাক্তারের পরামর্শে বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই ইউটেরাসটা কেটে ফেলেছে। ডাক্তারদের মতে, যতোদিন বাচবো, অনেকটা সুস্থতার সঙ্গেই হয়তো বাচতে পারবো। বলা শেষ করে আমার ছেলেমেয়ের কথা জানতে চাইলো।

বললাম, চারটা মেয়ে সন্তানের পরম সৌভাগ্যবান পিতা আমি। আর আমারও একটা মাত্র ছেলে।

একটা মাত্র ছেলের কথা শুনেই তার বিষণ্ন চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠলো। বললো, ছেলেটা কি করে?

বললাম বম্বে আইআইটি থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পাস করে এখন এমএস করার জন্য আমেরিকায় আছে। ইদানীং কোর্স শেষ করে একটা ভালো চাকরিও করছে।

কি যেন বলতে চেয়ে সে চেপে গেল। শুধু বললো, আমি খুব তাড়াতাড়ি আবার আসবো।

এবার শুধু ব্যক্তিগত নয়, পারিবারিক বিষয়েই উঠে এলো। ছ ঠিক এগারো দিনের মাথায় ঢাকা চলে এলো একাই।

এসে বললো, ভাইজান, একাই আসতে হলো। আপনাদের জামাই ব্যবসায়িক খুব একটা জরুরি কাজে জাপান চলে গেছে। তার সালাম বয়ে নিয়ে এসেছি।

তারপর একদম সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে বললো, আমার বড় আদরের ধন একমাত্র মেয়েটিকে আপনার ছেলের জন্য আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। আপনি দয়া করে আপত্তি করবেন না। আমার লক্ষ্মী মেয়েটিকে আপনি কবে আশীর্বাদ করে আসবেন তা আমাকে বলে দিন। আর আপনার ছেলেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার দেখার দরকার নেই।

টেলিফোনে আমেরিকায় ছেলের সঙ্গে কথা বললাম।

সে বললো, আব্বা, তুমি আর আম্মার যেখানে পছন্দ, আমারও সেখানেই পছন্দ, তোমরা এগোতে পারো।

চট্টগ্রাম গিয়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয়া জননীর ব্যবহৃত একটা গলার হার (যদিও সেটা ডিজাইনে সেকেলে) দিয়ে মেয়েটির (বাবার সঙ্গে জাপান থেকে চলে আসা) গলায় পরিয়ে দিয়ে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করে এলাম।

কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে ছেলে ঢাকা এলো। ধুমধামেই বিয়ে হয়ে গেল। দিন পনেরো দেশে থেকে ছেলে চলে গেল আমেরিকায়। একমাত্র ছেলের বৌ আমাদের কাছেই রইলো। মাস দুয়েকের মধ্যে হৃদয়-মন হিল্লোলিত হলো যখন জানলাম বৌমা অন্তঃসত্ত্বা।

বাংলাদেশের চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী ডাক্তারদের মোটামুটি নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বৌমা চলে গেল চট্টগ্রাম মা–বাবার কাছে। নির্দিষ্ট সময়ে সুসংবাদ এলো বড় সুন্দর একটি নাতনির দাদা হয়ে গেছি। গিন্নিকে নিয়ে ছুটলাম চট্টগ্রামে।

নতুন নানি শুধু দামি নতুন জামা কাপড়ই নয়, মাথায় সোনার তাজ, হাতে সোনার বালা পরিয়ে আমার কোলে আগে দিয়ে বললো, ভাইজান, আপনার নাতনির চোখ দুটো দেখেন, ঠিক আপনার মতোই হয়েছে। আমি তার নাম রেখেছি কাজল।

বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে তার ছোট তুলতুলে গালে একটা চুমু একে দিয়ে বললাম, চেহারাটা যে অবিকল নানির মতোই হয়েছে, কি বলো গিন্নি। তারপর বললাম, গিন্নি, তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে কাজলই হোক আমার শেষ প্রেম।

দেখলাম দাদি–নানি দুজনার মুখেই চিকন হাসির রেখা।

পূর্ব গোড়ান, ঢাকা থেকে

আকাশ ও আকাশী

– গোলাম মোস্তফা

আকাশীর হাতটা চেপে ধরে কান্না করে মনটাকে একটু হালকা করবো, তারও সুযোগ ছিল না তার পরিবারের সব সদস্য উপস্থিত থাকার কারণে। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার চোখ দুটিও অবাধ্যের মতো কোনো বাধা মানছে না। তাই ছুটে এলাম।

তার পরদিন শেষ দেখা করতে গেলে আকাশী আমার হাতে তিনটা চিঠি দিয়ে শুধু বললো, প্রবাসে গিয়ে ভালো থাকবেন।

আকাশী শেষ চিঠিতে লিখেছিল :

আকাশ

ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইলো। যতো কাছে টানি ততো দূরে চলে যাও। বন্ধু, আমি যদি জানতাম যে, তুমি এভাবে চলে যাবে তাহলে হয়তো এতো গভীর করে ভালোবাসতাম না তোমাকে। এতো আপন করে নিতাম না। তুমি জেনেশুনে কেন আমাকে এতো বড় মায়ার জালে আটকালে। কেন? যাকে আমি বেশি ভালোবাসি সে আমাকে একা ফেলে চলে যায়, আমাকে কষ্ট দেয়, বার বার আমাকে কাঁদায়। বিদেশ গিয়ে আমার কথা স্মরণ করিও, ভুলে যেও না। তোমার সঙ্গে এটায় মনে হয় আমার শেষ দেখা। এসে হয়তো আমাকে আর দেখবে না। আমার খুব ইচ্ছা ছিল। সেটা আর হলো না। আমি অসুস্থ অবস্থায় তোমার কাছে চিঠি লিখছি। তাই কি লিখতে কি লিখেছি জানি না, ভুল হলে মাফ করো।

বন্ধু, তোমাকে বড়ই ভালোবাসি।

–আকাশী

ছিলে হৃদয়ে, ছিলে ভালোবাসায়, শুধু ভাগ্যে ছিলে না তুমি আমার। আকাশী, তোমাকে আজও ভালোবাসি। আসার আগে আমার গালে যে চুমুটা দিয়েছিলে সে স্থানটা প্রতিদিন ছুয়ে দেখি। আকাশী, তোমার হাত থেকে খুলে দেয়া ব্রেসলেট তোমার স্মৃতি স্বরূপ আমার হাতে শোভা পাচ্ছে।

আকাশী, ভ্যালেনটাইনস ডে–তে ভ্যালেনটাইনস ভালোবাসা রইলো তোমার প্রতি।

সউদি আরব থেকে

অজানা

– জাহাঙ্গীর

তখন ক্লাস টেনে পড়ি হালুয়াঘাট আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে। আমাদের স্কুলে যাওয়ার পথ গরু বাজারের মাঝখান দিয়ে। তার কিছুদূর পরেই মিশন হাই স্কুল। নিয়ম মতো একদিন স্কুলে যাচ্ছি। তখন বর্ষা ঋতু। রাস্তায় মানুষজন খুব একটা নেই। কয়েকটা দোকানপাট খোলা। একে তো সকাল, তার উপর রাস্তাঘাট কাদায় ভর্তি। মানুষ হেটে যাওয়ার জন্য কাদার ওপর বালি ভর্তি বস্তা রাখা আছে। সেই বস্তার ওপর দিয়ে হেটে যাচ্ছি। এক বস্তা থেকে আরেক বস্তায় প্রায় লাফ দিতে হয়। একটা একটা করে বস্তা পার হচ্ছি।

এবার বস্তা শেষ। তাই নেমে যাওয়ার জন্য প্যান্টটা একটু উচিয়ে নেয়ার জন্য দাড়ালাম। অমনি পেছন থেকে কে যেন আমাকে জাপটে ধরলো। পেছন ফিরতেই দেখি একটা মেয়ে, বয়স প্রায় চোদ্দ পনেরো হবে। আশ্চর্য আমাকে ধরে ফেলাতে মেয়েটি লজ্জা না পেয়ে হেসে দিলো?

আমি তো হতবাক। প্যান্ট সামান্য উচিয়ে চলে যাচ্ছি স্কুলের দিকে।

মেয়েটি এবার আমাকে পেছনে ফেলে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কয়েক কদম গিয়ে সে আবার আমাকে পেছন ফিরে দেখলো এবং আবারও সেই মুচকি হাসি। এভাবে সে আমাকে কয়েকবার দেখলো।

বেশ পুলকিত হলাম। ভাবলাম, তবে কি মেয়েটি আমাকে প্রথম দেখাতেই...! না, না ... সে কি করে হয়! কারণ, আমার চেহারা তেমন সুদর্শন তো নয়ই, বরং আমার মতে বাংলা পাচ।

মেয়েটি মোড় নিল মিশন স্কুলের দিকে। তার পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে মিশন স্কুলে পড়ে।

আমিও স্কুলে চলে গেলাম।

গিয়ে দেখি ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। প্রথম ক্লাস আ... স্যারের। তার নীতি হলো, ক্লাস শুরু হয়ে গেলে কেউ সামনে দিয়ে না ঢুকে পেছন দরজা দিয়ে ঢুকে চুপচাপ ক্লাস করা। আমিও তাই করলাম।

ছেলেদের ডানপাশের সিটে বসে মেয়েরা। ক্লাসে ঢোকার মিনিট পাচেক পরেই মেয়েরা হাসাহাসি শুরু করে দিলো।

বুঝতে পারলাম না কি হচ্ছে।

হই চই শুনে স্যার ধমকে উঠলেন।

কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই ওরা ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিলো।

আমি তো হতবাক।

স্যার, আমার কাছে এসে আমার গালের দিকে চেয়ে ডাস্টার দিয়ে একটা আচ্ছা পিটুনি দিয়ে বললেন, যা বদমাশ, বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে আয়।

এদিক–সেদিক তাকিয়ে কিছু না বুঝেই যন্ত্রের মতো বাথরুমের দিকে চলে গেলাম। বাথরুমের গ্লাসে চোখ পড়তেই দেখি লিপস্টিক মাখা দুটো ঠোট বসে আছে আমার ডান গালে।

লজ্জায় আর ক্লাসে ঢুকলাম না।

তারপর প্রায়ই দাড়িয়ে থাকতাম মিশন স্কুলের গেটে। কিন্তু তাকে খুজে পাইনি। এখনো হাজার মানুষের ভিড়ে তাকেই খুজি যে আমাকে উপহার দিয়েছিল এক অজানা...।

হালুয়াঘাট থেকে

বৌ পাগল মানুষ

– মাসুদুর রহমান

আজ এক নতুন গল্প শোনাবো। আমার এই গল্পে ভালোবাসার ছোয়াটা যে কতোটা অকৃত্রিম তা–ই আপনাদের বলবো। আমি একটা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে পার্টটাইম কাজ করি। শনিবার এবং রবিবার যেহেতু আমার

ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকে সেই সুবাদে নিজেকে একটু ব্যস্ত রাখা এবং একটু আয় করা। এ রকমই এক শনিবারে আমার বস আমাকে জানালেন যে, আজ আমাদের রেস্টুরেন্টে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান আছে। অনুষ্ঠানের নাম *টেলিফোন বিয়ে।* আমি এর আগে টেলিফোনের বিয়ের কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু আমার নিজের চোখে অথবা সামনে কোনোদিন হতে দেখিনি। তাই টেলিফোন বিয়ের কথা শুনে আমিও একটু পুলকিত হলাম।

বিকাল তিনটাই বিয়ের কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শুরু হলো সাড়ে তিনটায়। সেদিন বাংলাদেশে হরতাল থাকার কারণে শুরু হতে দেরি হলো। আমি অবশ্য এর মধ্যে স্পিকার ফোনের সব ব্যবস্থা করে দিলাম যাতে সবাই বাংলাদেশের কথা শুনতে পারে। ফোন লাগানো হলো বাংলাদেশে। এই দিকে খুব হই চই শুনে বুঝতে পারছিলাম খুব মজা করছে সবাই। এখানে যার বিয়ে হচ্ছিল সেই ভাই অনেক দিন থেকে জাপানে থাকার কারণে তারও অনেক বন্ধু এসেছিলেন। এছাড়া ছেলের বড় ভাইও এখানে থাকেন। তাই তিনিই এখানকার সব কথাবার্তা পরিচালনা করছিলেন।

নোয়াখালী অঞ্চলের বিয়ের ব্যাপারে আমার আগে কোনো ধারণা ছিল না। কারণ আমি হলাম ঢাকার বাসিন্দা এবং উত্তরবঙ্গের লোক। এছাড়া আমার কোনো বন্ধু ছিল না ওই অঞ্চলের। বিয়ে পড়ানোর আগে মৌলভি বারে বারে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, এই দিকে মজলিসে কতোজন লোক আছে। চল্লিশজনের কম হলে তিনি বিয়ে পড়াতে অপারগ হবেন বলেও জানাই দিলেন। যদিও এদিকে চল্লিশজনের মতোই ছিল। কিন্তু চল্লিশজন ছিল না। ছেলের বড়ভাই কায়দা করে জানিয়ে দিলেন, এদিকে চল্লিশজনই আছে।

বিয়ে পড়ানো শুরু হলো। মজাটা বাধলো যখন ছেলেকে কবুল বলতে বলা হলো। ছেলে তো কবুল বলেন না, খালি এদিক–ওদিক তাকান। ছেলের এই অবস্থা দেখে তো ওনার বন্ধুরা খুব খেপে গেলেন। এমনিতেই ছেলের প্রেমজনিত কোনো কারণ ছিল না যে, হ্যা বলবেন না। ওই দিক থেকে তো মৌলভি বার বার বলেন, বাবা, হ্যা বলো।

কিন্তু ছেলে তো হ্যা বলেন না।

এই সময় ঘটলো বিপত্তি। ছেলের বন্ধুরা সবাই মিলে জোরে এক ধমক দিতেই ওই পাশে মৌলভি মারশাআল্লাহ আর আলহামদুলিল্লাহ বলা শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে তো সবাই মুখ চাওয়া–চাওয়ি করে... সবাই ঘটনাটা হলো কি? ওনাদের ভাবতে ভাবতেই মোনাজাত শুরু হয়ে গেল। মোনাজাত শুরু হয়েছে। কিন্তু ছাড়ার নাম নেই। চলছে তো চলছেই। এদিকে তো আমরা খাবার দিতে শুরু করে দিয়েছি। তাই খাবারের মৌ মৌ গন্ধে সবার মন মোনাজাতের চেয়ে খাবারের দিকেই নিহিত হচ্ছিল বেশি।

দুই একজন তো ধৈর্য হারা হয়ে বলেই ফেললেন, ভাই, লাইনটা কেটে মোনাজাত শেষ করেন। পরে বলবেন টেলিফোনের লাইন কেটে গেছে। ওদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, বিয়েতে যেন আসার মূল উদ্দেশ্য, বিনা পয়সাই ভুড়ি ভোজ।

যাহোক, সময় মতো, সব ভালো মতো শেষ হলো, এবং সবাই খাবার খেয়েই বিদায় নিল। বসে থাকলেন শুধু যিনি বর তিনিই। কারণ ওনার কিছু বন্ধু রওনা দিয়েছে এবং পথেই আছেন। সুতরাং তাদের জন্যই অপেক্ষা ওনার। এই সময় ওনাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, ভাবীকে আগে থেকে চেনেন কি না? কি পড়ছেন? কোথায় থাকেন? এই সব। কিন্তু ওনার এ ধরনের উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। মাত্র একদিন আগে ওনার বিয়ে ঠিক করে ওনার ছোট ভাই। তিনি মেয়েকে দেখেনি। মেয়েকে না দেখেই বিয়েতে রাজি হয়েছেন। কেননা তিনি মেজ হওয়ায় পরেও ওনার সব ভাইয়েরা বিয়ে করে দুই বাচ্চার বাবা হয়ে গেছেন। তাই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

দুই সপ্তাহের পরের ঘটনা।

ওই ঘরের বড় ভাই আমার কাছে এলেন। আমি তো ভাবলাম করলাম মনে হয় কিছু কিনতে অথবা খাবার জন্য এসেছেন। না, তিনি এসেছেন পরামর্শের জন্য। আমি পড়ালেখা করছি বলে সবাই আমাকে খুব ভালোবাসে এবং ওনাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে আমার কাছে পরামর্শের জন্য আসেন। আমার সাধ্যমতো ওনাদের সাহায্য করি। বুদ্ধি দিতে তো আমার আর টাকা লাগে না! কিন্তু আমি জানি এই অবৈধভাবে বসবাস করা বাংলাদেশিরাই বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে দেশের রেমিটান্স বাড়াতে সাহায্য করছে। আমি ওনার সব ঘটনা শুনলাম।

সমস্যা ওনার না, ওনার বিয়ে করা ভাইয়ের। সারাক্ষণ নাকি টেলিফোন নিয়ে বসে আছেন। সারাক্ষণ নাকি নতুন বৌয়ের সঙ্গে কথা বলছেন।

আমি তো শুনে হাসতে হাসতে ওনাকে বললাম, ভাই, এটা হলো *বৌ পাগল ভালোবাসা।* মাত্র বিয়ে হলো তো! সুতরাং কয়েকদিন এ পাগলামি থাকবেই। এই পাগলামি যারা করে তারা এ পাগলামির অনুভূতি নিয়ে বিদেশে বেচে থাকতে চাই। তাই ওনাদের বাধা দেবেন না।

আশ্চর্য হচ্ছেন, তাই না? কিন্তু যারা বাইরে থাকে তারা বেশির ভাগই বৌ পাগল হয়ে থাকে। এ ভালোবাসা অকৃত্রিম এবং একটু সুখের ছোয়া পাবার আশাই।

masud@e-kobi.net

সিগারেট

– সামু

সেদিন বেলা তিনটার দিকে বাসস্ট্যান্ডে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই সে এলো একটা রিকশা করে। পরনে নীল শাড়ি, কপালে লাল টিপ। ঠিক যেন স্বর্গের অপ্সরী। আমি হা হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

সে বললো, রিকশায় ওঠেন।

দ্বিরুক্তি না করে সুবোধ বালকের মতো রিকশায় উঠলাম।

সে নিজ থেকেই বললো, আজ আমাদের স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান। আমি চলে এলাম। এ সুযোগে একটু ঘুরে বেড়াই।

রিকশা গিয়ে সংসদ ভবনের সামনে থামলো। দুজনে হেটে কৃসেন্ট লেকের পাড়ে গিয়ে বসলাম।

কথার ফাকে সে বললো, বাসায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি মাঝে মধ্যে আপনার সঙ্গে ঘুরতে চাই।

তাকে আমার এক টেলিফোন ব্যবসায়ী বন্ধুর নাম্বার দিয়ে বললাম, তোমার সুযোগ হলেই আমাকে ইনফর্ম করো। আমি যাবো।

এক সময় একটা সিগারেট ধরালাম। হতবাক করে বললাম, একটা টান দিয়ে দাও।

সে তাই করলো।

তার ওই ঠোটের গন্ধ মাখা সিগারেট আমাকে চরম পুলকিত করলো।

সময়ের তালে তালে আমাদের সম্পর্ক দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চললো। যখনই তার সঙ্গে বের হতাম, আমার সিগারেট তার নরম ঠোটের পরম গন্ধ মাখিয়ে চরম পুলকে ফুকতাম।

একদিন সে টেলিফোন করে বাসায় ডাকলো। গিয়ে দেখি বাসা ফাকা। সে সেজে গুজে বসে আছে ড্রয়িংরুমে। একেবারে ডানাকাটা পরী। দুজনে বসে আমিন খান এবং কারিশমা কাপুরের *রাজা পরদেশী* ছবিটা দেখছিলাম। ছবির এক দৃশ্যে কারিশমা কাপুর আর আমিন খানের চুমুর দৃশ্য আমাকে বেসামাল করে তুললো।

পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে তাকে দিলাম।

সে জিজ্ঞাসা করলো, প্রায়ই আমাকে দিয়ে কেন সিগারেট টানাচ্ছো?

আমি মিথ্যা বলতে পারিনি।

সে কামনার্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে বললো, ভীতুর ডিম।

এক পর্যায়ে আমার মুখের সিগারেটটা নিয়ে অ্যাশট্রেতে রেখে আমার দুই কাধে হাত দিয়ে একটা ছোট্ট চুমু খেলো। আমার শরীরের সমস্ত রক্ত নালিতে রক্তের প্রবাহ তীব্রতর হলো। তাকে জড়িয়ে ধরে আমিও চুমু খেলাম। আমার ক্ষুধার্ত যৌবন আজ আর কোনো বাধাই মানতে চাইলো না। দুরন্ত হাত তার সারা দেহ ছুয়ে চললো। এক সময় তাকে নিরাবরণ করলাম।

খোলসমুক্ত দেবী তখন একেবারে স্বমূর্তিতে।

আমি তাকিয়ে আছি।

সে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললো, কি দেখছো?

উত্তর দিতে পারলাম না। মনে মনে বললাম,

একি রূপে করিয়াছেন সৃজন বিধাতা প্রভু

মিটিবে না সাধ দেখিয়া তোমায় জনম জনম তবু

আমিও খোলসমুক্ত হলাম।

সে আমার মাঝে সমর্পিত হলো। ঝড়ের পরে তার ঘর্মাক্ত কপোলে চুমুর তিলক একে বিদায় নিলাম।

তারপর থেকে সুযোগ পেলেই মিলিত হতাম। আর সুযোগ না পেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে তার ব্যাগে সিগারেটের প্যাকেট ঢুকিয়ে দিতাম। সেভাবে তার ঠোটের পরোক্ষ স্পর্শেই রোমাঞ্চিত হতাম।

ক্রমেই এটা আমার নেশায় পরিণত হলো। একদিনও তাকে না দেখে চলতো না। সেও পারতো না।

সুখ কপালে বেশি দিন সইলো না। আমার চাকরি হলো। চলে এলাম সুদূর রাঙামাটিতে। তবু মাসে কমপক্ষে দুবার তার কাছে ছুটে যেতাম। প্রথম প্রথম সে অভিমান করতো এতো দেরি করে আসার কারণে। দিনে দিনে সে কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেল। আগের মতো সাড়া দেয় না। সিগারেটের ফিল্টারে ঠোটের পরশ দেয় না। তাহলে কি শেক্সপিয়ারের কথাই সত্যি?

Short absence quickens love
Long absence kills it.

প্রকৃতি পাগল এই আমি রাঙামাটির রূপ সৌন্দযের মাঝে নিজেকে খাপখাওয়াতে পারি না। অসহায় মনে হয়। তার কথা মনে পড়লে সিগারেটের নেশা বেড়ে যায়। কিন্তু সিগারেটের সেই গন্ধের বৈচিত্র থেকে আজ আমি বঞ্চিত। ওই সুধাময় দিনগুলোর কথা মনে পড়লে ব্যথায় নীল হয়ে যাই। টেনিসন–এর কবিতাটি মনে পড়ে :

Time marches on but memories stay
Torturing silently the rest of our day.

রাঙামাটি থেকে

দেবদাস

– এম.ম. রহমান

আমি যখন ক্লাস টেনের ছাত্র ঠিক তখনই আমার দাড়ি–গোফ উঠতে শুরু করে। ততোদিনে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস শেষ করেছি আর পার্বতী না থাকলেও নিজেকে দেবদাস ভাবতে শুরু করেছি।

এ সময়ে একদিন পাশের গ্রামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসে আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। পরের দিন ছিল ২৫ ডিসেম্বর । কৃশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের বড়দিন। বড়দিনে তার প্রেমিকাদের বাড়িঘর সাজানো, গেট সাজানোর জন্য ব্যানারে শুভ *বড়দিন* লেখা, রঙিন কাগজ দিয়ে ফুল, লতাপাতা কাটা এসব কাজ আমাকে করতে হবে। কাজগুলো আমি সুচারুভাবে করতে পারতাম ।

বন্ধুর ঘরে বসে আমি আর আমার সেই বন্ধু মিলে হারিকেনের আলোয় রাতে যখন এই কাজগুলো করছি তখন বন্ধুর ছোট বোন বিনু আমাদের কাজে সহযোগিতা করছিল। বিনু তখন ক্লাস সেভেন-এর ছাত্রী। পুষ্পপল্লবে মুকুলিত কৈশোর। সে যখন বেণী দুলিয়ে আমার কাজে সহযোগিতা করছিল তখন আমার মনে হলো সে আমাকে খুব পছন্দ করছে। এক সময় বন্ধুটি ঘুমিয়ে গেল। এবং গভীর রাত পর্যন্ত আমি আর বিনু ফুল, লতাপাতা কাটলাম।

সকালে ঘুম থেকে ওঠে মুড়ি আর চা খেলাম। যখন বাড়ি আসবো ঠিক তখনই তাদের বাড়ির উঠানের গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ তুলে অতি গোপনে সে আমার হাতে দিল।

আমরা প্রেমের নদীতে অবগাহন শুরু করলাম। বিনুদের বাড়িতে ঘন ঘন যেতে থাকলাম। নিবিড় ভালোবাসায় একাকার হয়ে গেল দুটি হৃদয়।

এভাবেই চলে গেল আরো পাচটি বছর। এই পাচটি বছরে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হলো। পরিবর্তন হলো বিনুদের মানসিকতার ।একটা হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেল ওদের বাড়িতে। সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। ওরা চলে গেল শহরে। কেন জানি না বিনু যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। তার গার্ডিয়ান আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে এবং আমার পরিবারপ্রধানকে বলে গেলেন আমি যেন বিনুর সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ না রাখি। আমাদের বাড়ি থেকেও আমাকে কঠিন শাসনে রাখা হলো। এভাবেই আমাদের প্রেমের মৃত্যু হলো। হৃদয়ের গভীরে দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। ততোদিনে সত্যিকার দেবদাস হয়ে গেলাম।

কিছু দিন পরে যখন তার সঙ্গে দেখা তখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে জিজ্ঞাসা করলাম, সুখে আছো তো?

ও শুধু কাদলো, কোনো কথা বললো না।

হৃদয়ের পুঞ্জিভূত ঘৃণা একত্র করলাম। কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে সজোরে তার গালে একটি চড় কষে দিলাম। তবুও সে কিছু বললো না । শুধু আমার হাত দুটি ধরে গভীর কান্নায় ভেঙে পড়লো।

বাগমারা, রাজশাহী থেকে

মিস ওয়ার্ল্ড

– শ্রাবণ

জানিস রুনি, আমি ক্যামেরা কিনেছি।

কি? স-ত্যি-ই বলছিস। বড় বড় সুন্দর দুই চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে রুনি তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। একরাশ খুশির ঝিলিক বার বার কাপিয়ে দিচ্ছে তার শরীর। তবু সাগরকে যেন একদম বিশ্বাস নেই। রুনি তাই এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়।

রুনি যে তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি তা বুঝতে পারে সাগর। তার ঘরে বিছানায় ওপর পা তুলে আয়েশি ভঙ্গিতে বসে আছে রুনি। সাগর বসেছে একটা চেয়ারে। সেখান থেকে উঠে গিয়ে সাগর তার ওয়ারড্রাবটা খোলে। সদ্য কেনা জাপানিজ *অটোমেটিক অলিম্পাস ক্যামেরাটা* বের করে ছুড়ে দেয় বিছানার দিকে। ছোট হালকা ক্যামেরাটা ডিগবাজি খেয়ে রুনির পায়ের কাছে এসে থামে।

মুহূর্তেই ক্যামেরাটা রুনির তালুবন্দী হয়। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সে। বিছানা থেকে নেমে ছন্দময় ভঙ্গিতে হেটে আসে সাগরের একদম কাছে। গলা বাড়িয়ে সাগরের মুখের কাছে নিজের মুখটা নিয়ে যায়। তারপর ছোট্ট মেয়ের মতো আহ্লাদি সুরে বলে, এই সাগর, কাল আমার পুরো এক রিল ছবি তুলে দিতে হবে।

পারবো না তোর ছবি তুলতে। সাগরের গলায় কৃত্রিম রাগ।

কেন পারবি না?

তুই আমাকে মিথ্যুক ভাবিস, অবিশ্বাস করিস। অথচ তুই জানিস না ক্যামেরাটা আমি শুধু তোর কথা ভেবেই কিনেছি।

আমাকে ভুল বুঝিস না। বিশ্বাস কর, আমি ভেবেছিলাম তুই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছিস। মিনতি ভরা চোখে সরাসরি সাগরের চোখের দিকে তাকায় রুনি। ডান হাত দিয়ে আলতো করে চাপ দেয় সাগরের কাধে।

আচ্ছা যা। তোর ছবি আমি তুলে দেবো। ফিল্ম, ব্যাটারি, ওয়াশ, ডেভেলপ সব খরচ আমার। তুই শুধু...। এটুকু বলতে গিয়ে সাগরের হার্ট বিট বেড়ে যায়। গলা শুকিয়ে আসে। দুই তিনবার ঢোক গিলেও গলাকে ভেজাতে পারে না।

কি? রুনি জানতে চায়।

তুই শুধু আমার সার্ভিস চার্জটা দিবি। কোনো মতে কথাগুলো বলে সাগর।

ইঙ্গিত বুঝতে পারে রুনি। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠে মুখ। দুই আঙুলে টিপে ধরে সাগরের নাক। কপালে কপালে ঠুন দেয়। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে, পাবি। তারপর এক ছুটে পালিয়ে যায়।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সাগর। রুনির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাকে রীতিমতো ঘামিয়ে তুলেছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল খুব। রুনি চলে যাওয়ায় সে যেন মুক্তির আনন্দ পেল।

সাগরের জীবনে মেয়েদের সান্নিধ্য খুব কম। তার আপন কোনো বোন নেই। মা-বাবা দুজনেই চাকরিজীবী। সারা দিন বাইরে ব্যস্ত সময় কাটানোর পর মায়ের কাছে খুবই কম সময় পায়। খালা, ফুপু, চাচিরাও দূরে থাকেন। ফলে অনেক দিন পর যখন তাদের সঙ্গে দেখা হয় তখন সাগর স্বাভাবিক হতে পারে না। এমনকি কম্বাইন্ড কলেজে পড়লেও সেই অর্থে সাগরের কোনো বান্ধবী নেই। যে মেয়েগুলোর সঙ্গে তার কথা হয় তাদের সঙ্গেও তুমি কেমন আছো, আমি ভালো আছি, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে এর বাইরে কোনো কথা হয় না। যথেষ্ট স্মার্ট এবং এট্রাকটিভ ও। স্বাভাবিকভাবেই মেয়েরা তার প্রতি আকৃষ্ট হতো। কিন্তু সাগরের নিরুৎসাহিত ভাব দেখে তারাও উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

সাগরের জীবনের একমাত্র মেয়ে, একমাত্র তরুণী রুনি। একমাত্র বান্ধবীও রুনি। রুনি সম্পর্কে সাগরের দুঃসম্পর্কের বোন। প্রায় সমবয়সী হওয়ায় ছোটবেলা থেকে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যোগাযোগটাও মোটামুটি নিয়মিত হয়। বেশ খানিকটা দূরত্বের পথ হলেও চার ছয় মাস পর পর একটানা পাচ সাত দিনের জন্য এক সঙ্গে থাকা পড়ে। কখনো সাগর খালা বাড়ি যায়, কখনো রুনি আসে। তবে রুনির আসা পড়ে বেশি। সাগর একমাত্র ছেলে হওয়ায় এবং এর কোনো বোন না থাকায় এ বাড়িতে রুনির বিশেষ স্থান আছে। রুনি যে কয়েকদিন এখানে থাকে, সাগরের মা অফিস থেকে ফিরেই রুনিকে নিয়ে মেতে থাকেন।

হাতে গোনা কয়েকজন ছেলের সঙ্গে সাগরের গভীর বন্ধুত্ব আছে। সে সবার সঙ্গে মিশতে পারে না। যাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, যাদের সঙ্গে সে আড্ডা দেয় নিয়মিত তাদেরকেও মাঝে মধ্যে অসহ্য লাগে। যখন তাদের আলোচনায় মেয়েদের প্রসঙ্গ, মেয়েদের শরীর, বিভিন্ন মেয়ের স্বভাব-চরিত্র কিংবা অশ্লীল সব জোকস আসে তখন সাগরের খুব খারাপ লাগে। তার এ বন্ধুরাই মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশে, তাদের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাদেরকে কষ্ট দেয়। আবার সেসব গল্পই রসিয়ে রসিয়ে অন্যদেরকে বলে। ঘৃণা হয়। তবু নিঃসঙ্গতা কাটাতে তাদের কাছেই ফিরে যায়।

এ জন্য যে কয়েকদিন রুনিকে কাছে পায় সে কয়েকদিন যেন সাগরের স্বপ্নের মতো কেটে যায়। মেয়েদের সঙ্গে বয়স সুলভ দুষ্টুমি, খুনসুটি যা করার সব ও রুনির সঙ্গেই করেছে। একটু-আধটু অসভ্যতাও হয়তো কখনো কখনো করে ফেলেছে। রুনি সেসব উপভোগ করেছে। তবে কখনো শাসন করার প্রয়োজন বোধ করেনি। সতর্ক সাগর তার আগেই নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। রুনির কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দেখে খুশি হয়েছে সাগর। ধীরে

ধীরে চমৎকার বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে নিজেদের ভেতর। ফলে অনেক মাস পর যখন তাদের দেখা হয়, রুনি তার সব কথা অকপটে সাগরকে বলে। সাগরও কোনো কিছু বাদ দেয় না।

রুনির যে মাঝে মধ্যে মডেল হতে ইচ্ছা করে তা জানে সাগর। *এমটিভি, ফ্যাশন টিভি* এবং বিভিন্ন চ্যানেলের মিউজিক ভিডিও-র পোকা রুনি। এক সঙ্গে বসে টিভি দেখতে গিয়ে সাগর খেয়াল করেছে মডেলদের আর্ট, মুভমেন্ট, এক্সপ্রেশন যেন মুখস্থ করছে সে। নিভৃতে এগুলো রুনি যে প্র্যাকটিস করে তাও জানে সাগর।

সাগর-রুনি দুজনেই এবার এক সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ ছয় মাস তাদের দেখা হয়নি। শুধু মাঝে একবার রুনিদের বাড়ি গিয়ে খালা-খালুকে সালাম করে এসেছিল সাগর। সামনে পরীক্ষা। তাই দিনের দিন ফিরে এসেছিল। কিন্তু ওই শেষবার রুনির এক চ্যালেঞ্জ সাগরকে ক্যামেরা কিনতে প্রলুব্ধ করে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জমানো টাকায় ক্যামেরা কিনে ফেলে সাগর। সে জানতো খুব শিগগিরই রুনি আসছে তাদের বাসায়।

সে বছর এক নির্জন দুপুরে এমটিভি-তে মিউজিক ভিডিও দেখছিল। এক জোড়া মডেল ছেলেমেয়ে গানের তালে দৃষ্টিকটু রকমের ঘনিষ্ঠতা দেখাচ্ছিল। সাগর খোচা মেরেই বলেছিল, আচ্ছা রুনি, তুই মডেল হয়ে কি ওই রকম অন্য ছেলেদের সঙ্গে জড়াজড়ি করবি?

আগুন চোখে রুনি তাকিয়েছিল সাগরের দিকে। ঝামটা মেরে বলেছিল, আমি মডেল হবো তা তোকে কে বলেছে? আর মডেল হলেই ছেলেদের সঙ্গে ডুয়েট করতে হবে নাকি?

কথা শেষ করেই রিমোটের বাটন টিপে চলে গিয়েছিল ফ্যাশন টিভিতে। ঠিক সেই মুহূর্তে এক সারি নগ্নবক্ষা মেয়ে স্বল্প পোশাকে একের পর এক হেটে আসছিল মঞ্চে।

তাহলে তুই নিশ্চয়ই এভাবে স্বচ্ছ পোশাকে মডেলিং করতে পারবি। এখানে কোনো ছেলে নেই। মোক্ষম তীর ছুড়েছে ভেবে পরিতৃপ্ত বোধ করছিল সাগর।

অবশ্যই পারবো। দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছিল রুনি। শুধু তুই যদি ক্যামেরাম্যান হতে পারিস তাহলে আমিও শুধু খোলা বুকে না, *খাজুরাহো কোনারক* মন্দিরের মূর্তিদের মতো শৈল্পিক মডেল হতে পারবো। চ্যালেঞ্জ।

ওই মুহূর্তে থতমত হলেও সাগর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল।

এবার রুনি যখন সাগরদের বাসায় আসে তখন বিকেল। সন্ধ্যার মুখে মুখে তার খালা বাসায় ফিরে আসে। খালু ফেরেন আরেকটু পরে। খুব হই চই, আনন্দ-ফুর্তি হয়। রাতে খাওয়া দাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্প-গুজব চলে।

এ বাড়িতে রুনির জন্য আলাদা একটা রুম আছে। এক রুমে তার খালা-খালু থাকেন। আরেকটাতে সাগর। ছোট কিন্তু ছিমছাম করে সাজানো একটা রুম রুনির। খালার সঙ্গে গল্প শেষ করে রুমে যাবে। এমন সময় সামনে আসে সাগর।

ক্যামেরায় ফিল্ম, ব্যাটারি ভরে রেডি করে রেখেছি। সকালে আব্বু আম্মু অফিসে গেলে তোর ছুবি তুলবো। দেখা যাবে তোর কতো সাহস। রেডি থাকিস।

লাজুক হাসি দেয় রুনি। কোনো কথা বলে না মুখে।

সিল্কের নীল শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে লাজুক বধূর মতো ভঙ্গিমায় প্রথম ছবি তুললো রুনি। ম্যাচিং টিপ, চুড়ি, দুল। হায়! যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে তার শরীর থেকে। ধীরে ধীরে শাড়িটা তার শরীরের সঙ্গে আরো সেটে গেল। আচল টান টান করতেই ফুটে উঠলো বুকের রেখা। এক সময় ডান স্তনকে উন্মুক্ত করে দিয়ে হালকা মেঘের মতো সরে গেল আচল।

তোর লেমন কালারের সালোয়ার কামিজটা পরে আয়।

দীর্ঘ ওড়না মাথা শরীরে জড়িয়ে রাজেন্দ্রানী ভঙ্গিতে দ্বিতীয় দফায় ছবি তুলতে এলো রুনি। মাপা পা ফেলে শরীরে প্রয়োজনীয় ঢেউ তুলে একবার হেটে সামনে এলো আবার পেছনে গেল। ওড়নাটা দুই হাতে তুলে ডানে-বামে মাথা ঝাকিয়ে লাস্যময় ভঙ্গিতে হাসলো। তারপর ওড়নাটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। বডি ফিটিং জামায় বন্ধন ভেদ করে রুনির শরীর যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিটোল স্তন, সরু কোমর, গুরু নিতম্ব সব কিছু স্পষ্ট করে।

এরপর শর্ট স্কার্ট আর পৃন্টের হাওয়াই শার্ট পরে তৃতীয়বারের মতো সাগরের ক্যামেরার সামনে পোজ দিল রুনি। মাখনের মতো শাদা উন্মুক্ত দীর্ঘ পদযুগল সাগরের চোখের সামনে। একের পর এক ছবি নিয়ে চলেছে সে অপটু কম্পমান হাতে। নিষিদ্ধ উত্তেজনায় কাপছে বুক, শরীর।

হঠাৎ কিছুটা দূরে গিয়ে সাগরের দিকে পেছন ফিরে দাড়ালো রুনি। দ্রুত হাতে খুলে ফেললো শার্টের তিনটা বোতাম। আধ খোলা শার্ট ঠেলে তুলে দিল উপরের দিকে। শার্টের কলার নেমে গেল পিঠের একটু নিচে। ধবধবে শাদা পিঠে কামড়ে বসা কালো ব্রা-র স্ট্র্যাপ ও হুক বেরিয়ে এলো। মাথাটা কাৎ করে বাকিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে হাসি দিল রুনি।

তারপর এক ঝটকায় সামনে ঘুরে দাড়ালো অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। কালো ব্রার কাপে আটক কিন্তু গর্বে উদ্ধত দুটি স্তন আরো খানিকটা উচিয়ে ছন্দময় পা ফেলে সাগরের একদম কাছে চলে এলো রুনি।

এতোটা কাছে যে, রুনির শরীরের উত্তাপ নিজের শরীরে টের পেল সাগর।

ছবি তোলার কথা ভুলে গেল সে। তৃষ্ণার্ত ঠোট বাড়িয়ে রুনি তাকিয়ে ছিল সাগরের মুখের দিকে। রুনির তৃষ্ণা মেটাতে সাগর তার ঠোট ডুবিয়ে দিল।

মিস ওয়ার্ল্ড তুমি। আমি তোমায় ভালোবাসি। সাগর আবেগ ভরা স্বরে বললো!

ভালোবাসি। রুনি অস্ফুট স্বরে বললো।

উত্তেজনার চরম সীমায় পৌছে রুনিকে নিয়ে সাগর ঝাপিয়ে পড়লো বিছানায়।

খুলনা থেকে

প্রতারণার ৩৪৫ দিন

– জি.আর.এম শামসুল ইসলাম

২০০০ সালের ১৯ জুলাই আমার বড় মামা মারা যান। গেলাম মামা বাড়িতে। আর সেখানেই দেখা তিন্নির সঙ্গে। দুঃসম্পর্কে মামাতো বোন। বয়সে আমার চার ঘণ্টার ছোট। দুজনই সবেমাত্র এইচএসসি পাস। তিন্নি তার নানাবাড়িতে থেকে পড়ে। তাই প্রায় দশ বছর পর তার সঙ্গে দেখা। অর্থাৎ আমাদের দশ বছর বয়সে শেষ দেখা হয়েছিল।

বড় হওয়ার পর দেখা না হলেও মনে মনে তাকে ভালোবেসে ফেলি আমি। ভাবতাম ও খুব সুন্দরী। যদিও দেখা হবার পর আমার মনের মতো সৌন্দর্য তার মধ্যে পাইনি। কিন্তু না দেখেও যে তাকে ভালোবেসেছিলাম সেটা দমাতে পারিনি। মামাতো বোন হওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেলাম আমরা।

একদিন তিন্নি আমায় ধাধা দিল।

ধাধাটি হলো, কাশ্মিরের K, ইনডিয়ার I, ও কিসমিসের SS দিয়ে কি হয়?

সরাসরি বলে ফেললাম কিস। তারপর আমি প্রশ্ন করলাম, কেউ কি তোকে কিস করেছে?

সে বললো, না।

বললাম, তাহলে আমি তোকে করবো। আমি তোর প্রথম পুরুষ হতে চাই। আরো বললাম, আমিও কখনো কিস করিনি।

এটা মিথ্যা কথা ছিল ।

ও আমাকে বাধা দিল না । তিনটি কিস করার পর সে লাল হয়ে গেল।
ভাগ্যিস অল্পের জন্য মামি দেখে ফেলেননি।

কিছু দিন পর বাড়ি চলে এলাম। তারপর চিঠির মাধ্যমে প্রেম শুরু হয়। আমার প্রেম ছিল নিখাদ। কিন্তু ও আমাকে ভালোবাসতো না। ভালোবাসতো আমার দুটি ঠোটকে। কেননা তিন্নি পরবর্তীকালে আমার প্রায় পাচ হাজার কিস পেয়েছে।

প্রথম কিসের ৩৪৫ দিন পর একদিন ওর পরিবর্তিত ব্যবহারে বুঝলাম সে আমার নয়। ও খুব লোভী মেয়ে। প্রতিষ্ঠিত ছেলে ছাড়া বিয়ে করবে না।

ভাঙা মনে একটি চিঠি লিখে তিন্নিকে জানালাম যে, সে এখন মুক্ত। আমি আমার ভালোবাসাকে একটি চিঠির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দিলাম।

আমি এখন আর কোনো মেয়েকেই বিশ্বাস করি না, তেমন পাত্তাও দিই না । প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করছি। প্রতিষ্ঠিত হয়েই বিয়ে করবো যাতে আর কোনো মেয়ে প্রতারণা না করে।

ঢাকা থেকে

একটি স্বপ্নের অপমৃত্যু

– রোজী

মানুষের জীবনে অনেক কিছুই ঘটে। কিছু হারিয়ে যায় গহীন অন্তরালে। আবার কিছু মনে থাকে জীবনের পাতায়। ছোট্ট এ জীবনে মানুষ অনেক স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নগুলো কখনো মুখ থুবড়ে পড়ে। আমি অবশ্য যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা কখনো সফল হবে না জানতাম। তবে আমার বাবা-মা আমাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তার কিছুটা তুলে ধরছি। আমি দেখতে একেবারে আহামরি সুন্দর না হলেও প্রথম দর্শনেই যে কোনো পুরুষের নজর কাড়ার মতো। একজনকে ভালোবাসতাম। তাকে পাইনি। তবু তার স্বপ্ন ও স্মৃতি নিয়ে কোনো রকমে বেচে আছি। মাঝে মধ্যে অবশ্য খুব কষ্ট লাগে।

এর মধ্যে ২০০৩ সালের প্রথম দিকে আব্বুর পরিচিত একজন তার ছেলের জন্য আমাকে দেখতে এলেন। ছেলে তখনো বিদেশে। পাচ সাতজন নিয়ে এসে আমাকে দেখলেন এবং পছন্দ করলেন। ছেলের বাবা এবং অন্য সবাই ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে ফেললেন। কথা ছিল, ছেলে বিদেশ থেকে এলে দেখে বিয়ে হবে।

এর মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকলো না। তারাও আমাদের বাড়িতে অহরহ আসতেন। আমাদের ফ্যামিলিরও সবাই যেতো, এটা সেটা পাঠাতো। মোট কথা, তারা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থেকেও ঘনিষ্ঠতর হয়ে গেল। তাদের চোদ্দ গোষ্ঠির এমন কেউ নেই যে আমাদের বাড়ি আসার বাকি ছিল।

প্রতি সপ্তাহে একবার করে ছেলের বাবা আসতেন আমার আব্বু আম্মুকে বেয়াই বেয়াইন বলে সম্বোধন করতেন। এতো ভালো সম্পর্ক হয়ে গেল যা সাধারণত বিয়ের পরেও দেখা যায় না।

তাদের আত্মীয়স্বজন সবাই যেমন জানে, আমাদের আত্মীয়স্বজনও সবাই জেনে গেল। দেখতে দেখতে ২০০৩ সালের শেষের দিকে তাদের ছেলে ইটালি থেকে এলো। কথা ছিল, আসার পর পরই আমাদের এখানে আসবে। কিন্তু আমাদের আশার গুড়ে বালি। বিদেশ থেকে আসার পনেরো দিন পরেও যখন এলো না তখন আমার আব্বু তাদের ওখানে গেলেন। তখনো ছেলের বাবা আশ্বাস দিলেন এখন ঝামেলায় আছে, সময় করে একদিন যাবে। ঝামেলা মানে তারা অন্য জায়গায় মেয়ে দেখছে।

এর কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন ছেলের বাবা এসে হাজির। বললেন, ছেলে এখানে আসবে না। আপনারা মেয়েকে নিয়ে আমাদের ওখানে চলুন।

দেখুন পাঠক, এটা কোন ধরনের কথা। তাদের সঙ্গে তো আমাদের কথা এ রকম ছিল না।

এর এক মাস পরে খবর এলো তারা আসবে আমাদের এখানে। আমরা সেভাবে প্রস্তুত হতে লাগলাম। দশ পনেরোজন নিয়ে এলো আমাদের বাড়িতে। যথাসময়ে তাদের সামনে আমাকে আনা হলো। আবার আমাকে দেখলো যেন গরুর বাজারে গরু দেখছে ওইভাবে।

যাক, সবার পছন্দ হলো। শুধু ছেলের পছন্দ হলো না। অথচ আগে আমার ছবি দেখেই আমাকে পছন্দ করেছিল। আমার জীবনে এই প্রথম কোনো পুরুষ আমাকে অপছন্দ করলো। এটা আমার চরম ব্যর্থতা।

পাঠক, আপনারাই বিচার করুন, পুরো একটি বছর তারা আমাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। এমনকি তাদের পেছনে ওই একটি বছরে প্রায় বিশ হাজারের মতো টাকা খরচ হয়েছে। আর এখন বলছে, এখানে বিয়ে হবে না। কেমন বেইমান ওই বুড়োর বাচ্চা দেখুন। আমাদের সঙ্গে বেইমানি করলো। সমাজে আমাদের মানসম্মান ক্ষুণ্ন করে দিল। আত্মীয়স্বজনকে পর্যন্ত মুখ দেখাতে লজ্জা হলো।

আমি একজনকে না পাওয়ায় যে কষ্ট বুকে নিয়েছিলাম, ওখানে বিয়ে ঠিক হওয়ার পর তা কিছুটা হালকা হয়েছিল। কিন্তু তাদের বেইমানির দরুন আমার বুকের ছাই চাপা আগুন আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো বরং আরো দ্বিগুণ হয়ে। মাঝে মধ্যে ইচ্ছা করে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে। আবার চিন্তা করি, এটা কি ঠিক হবে? তারা আমাদের সঙ্গে বেইমানি করলো বলে আমরা অমানুষ হতে পারি না। আমার কষ্ট একটাই, আমার ভাঙা বুকে যে ভালোবাসার পুনর্জন্ম হতে চেয়েছিল যে অদেখা পুরুষকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল তা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। আমি কোনোদিন ভাবিনি, সে আমাকে অপছন্দ করবে।

আমার কপালে যা ছিল তাই হয়েছে। কিন্তু সবার সামনে আমি মুখ দেখাতে পারছি না। শুনছি ছেলের জন্য এখন অন্য জায়গায় মেয়ে দেখছে। আমার ভাগ্য আমাকে নিয়ে উপহাস করলো। আমার অনুরোধ, আর কোনো বাবা-মা যেন আমার বাবা মায়ের মতো ভুল না করেন। আমি যে কষ্ট পেয়েছি তা অন্য কেউ যেন না পায়।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

নামহীন সম্পর্কের ক্ষত

– লাবণী

ভোলা জেলার বাসিন্দা সে। আমাদের জেলার অতিথি। জাতীয় পতাকার বিশেষ রঙের নামে নাম তার। অবশ্যই তার পরিচিত নিন্দুকেরা বলে, এ তার ছদ্ম নাম। কিন্তু নামে কি আসে যায়, আমার কাছে সে শুধু সে, রক্ত মাংসের বিপরীত লিঙ্গের এক মানুষ। অদ্ভুত এক নামহীন সম্পর্ক বিরাজমান আমাদের মাঝে। না প্রেমের, না বন্ধুত্বের। কতোবার চেষ্টা করেছি দুজন এ সম্পর্কের একটি নাম দিতে। ব্যর্থ হয়েছি বার বার।

একবার বাড়ি যাওয়ার সময় অবশ্য সে আশ্বাস দিয়েছিল, তাকে আমার ইচ্ছেমতো যে কোনো সম্পর্কের মানুষ হিসেবে পরিচয় দেয়ার।

সেই আশ্বাস অনুযায়ী তাকে নিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবেছি। মেঘের ভেতর হাওয়ায় ভেসেছি। একই ছাদের নিচে ঘর বেধেছি। কিন্তু আমার প্রতীক্ষার দীর্ঘ একুশ দিন পর বাড়ি থেকে এসে সে যে সংবাদ আমায় দিল তাতে মনে হয়েছে এমন প্রাপ্তির চেয়ে অপেক্ষার দিনগুলো আরো সুন্দর ও মহৎ ছিল। সে ক্ষমা চাইলো। আমি কষ্ট বুকে দাফন করে চুপ করে থাকলাম। আমার অভিযোগহীন এমন নীরবতার মহত্বে সে অবাক ও অভিভূত হয়ে আমার বুকে টেনে নিল। দুজনের মাঝে এমন নীরব কষ্টের স্রোত বয়ে যাওয়ার পরও কেউ কাউকে ছাড়তে পারলাম না। ফের শুরু আসা-যাওয়া, দুজনের জীবনের দুঃখময় ইতিহাস বয়ান করা। গভীর কষ্টে দুজনের শীতল হাত এক করা।

তার সততায় অবাক হতাম। রাতের এমন নির্জন গভীরতায়ও সে আমায় এক বিন্দু অপবিত্রতার স্পর্শ করেনি, বরং কেমন নির্লিপ্ত থাকতো। একবার শুধু কষ্টের কথা বলতে বলতে আমায় গভীরভাবে জড়িয়ে ধরেছিল। সে জড়িয়ে ধরায় ভালোবাসা ছিল না বলেই রোমাঞ্চের বদলে কষ্টের ঢেউ খেলে গেল বুকে।

তার বিদায় বেলায় শত বাধা উপেক্ষা করে গিয়েছিলাম।

সে বললো, কাছে এসো।

আমি ধীর পায়ে কাছে গেলাম। এই প্রথম তার চোখের ভাষা পড়ে চমকে উঠলাম।

সে বললো, চোখ বন্ধ করো।

আমি চোখ বন্ধ করলে সে দাত দিয়ে আমার নিচের ঠোঁট চেপে ধরলো।

এমন আকস্মিক আক্রমণে আমি বিস্ময়ে দাতে দাত চেপে সহ্য করে থাকলাম। ব্যথায় চোখে পানি আসা পর্যন্ত সে চেপে থাকলো। ছাড়ার পর চোখের জল মুছে দিয়ে সামনে আয়না ধরলো।

দেখলাম আমার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ার মতো অবস্থা। ব্যথায় এক চিলতে হাসলাম।

সে বললো, চোটটা কোথায় লেগেছে, ঠোঁটে, না বুকে?

আস্তে করে নিচু মুখে বললাম, বুকে।

বললো, হ্যা, এ জন্যই এমন করেছি, ঠোঁটের ঘা শুকিয়ে গেলেও হৃদয়ের ঘা শুকাবে না।

সে চলে যাওয়ার পরও এক মাস আমার ঠোঁট ব্যথা করেছে। কিন্তু মনে হতো ব্যথাটা ঠোঁটে নয় বুকে বাজছে। আজো অজান্তে ঠোঁট কামড়ে ধরলে সে তীব্র ব্যথা অনুভব করি।

উপরের ঘা মুছে গেছে। কিন্তু ভেতরে যে দাগহীন ক্ষতের সৃষ্টি তুমি করে গেলে সেটা পরবাসী পৃথিবীর কোনো মলমেই শুকাবে না কোনোদিন।

সাগরিয়া, নোয়াখালি থেকে

শুরু

– মোমিনুল ইসলাম

সবেমাত্র এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছি। পড়াশোনার চাপ এখনো শুরু হয়নি। বেশির ভাগ সময় কাটে ঘোরাঘুরি আর আড্ডা মেরে। জীবনের সোনালি দিনগুলো যেন কেটে যাচ্ছিল এক এক করে। স্কুল জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে অনেকটা বাধাহীন জীবন। বেশ কাটছিল দিনগুলো।

এমনি একদিন শুনলাম ঢাকার খালা এসেছেন রাজশাহীতে। অর্থাৎ নানাবাড়িতে। নানার বাসা আমাদের বাসা থেকে কাছেই। ঢাকার খালা এলে অন্যান্য খালারা এসে জড়ো হন নানার বাসায়। বাসায় একটা উৎসবের আমেজ পাওয়া যায়। আমরা খালাতো ভাইবোনেরা বেশ মজা করি। তাই খবরটা শুনে ভীষণ খুশি হই। অবশ্য আমার খুশি হওয়ার আরো একটা কারণ ছিল। তা হলো বিথী আমার দূরসম্পর্কের খালাতো বোন। সে ক্লাস নাইনে পড়ে। বুদ্ধিমতী, দেখতে ভীষণ সুইট। তাই তার সঙ্গে গল্প করে ভীষণ মজা পাই।

বিকেলে খালার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে নানার বাসায় গেলাম।

আমাকে দেখেই খালা বললেন, কি রে আকাশ, আমরা এতোদূর থেকে এলাম আর তোদের কোনো খবর নেই। এখানে তো কেউ নেই। তুই এক এক করে সবাইকে নিয়ে আসবি। যে কয়দিন এখানে থাকি, সবাই মিলে আনন্দ করে যাই।

বললাম, ঠিক আছে, আমি কালই ছোট খালাকে নিয়ে আসবো।

খালা বললেন, শোন বীথিকেও নিয়ে যাস। সঙ্গে তিথিকেও নিয়ে যাবি।

আমি যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পেয়ে গেলাম। ভীষণ খুশি হলেও বাইরে তা প্রকাশ করলাম না। বীথিকে খবরটা জানিয়ে পরদিন রেডি থাকতে বলে চলে এলাম।

বাসায় এসে তিথিকে খবরটা দিলাম। তিথি আমার ছোট বোন। কিন্তু আমরা বন্ধুর মতো আবার শত্রুও বটে। সুযোগ পেলেই আমার কাছ থেকে কিছু টাকা বাগিয়ে নেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

বললো, আমি তোদের সঙ্গে যেতে পারি তবে আমাকে একশ টাকা দিতে এবং আইসক্রম খাওয়াতে হবে। আর আমি না গেলে খালা নিশ্চয় তোমার সঙ্গে বীথিকে পাঠাবে না।

এমন সুযোগ কে হেলায় হারাতে চায়। তাই তার শর্তে রাজি হয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে নানার বাসায় গিয়ে বীথিকে নিয়ে তিথিসহ আমি বের হলাম। ছোট খালার বাসার দূরত্ব কিছুটা বেশি হলেও আমরা রিকশায় যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম যাতে করে পথে কিছুটা বেশি সময় পাওয়া যায়। তিনজন আমরা এক রিকশায় চড়লাম।

রিকশা চড়েই বীথি বললো, একটা ক্যামেরা হলে মন্দ হতো না।

যেমন বলা, অমনি বললাম, নো প্রবলেম, এখনি ব্যবস্থা করছি।

রিকশা মোড়ের ওপর যেতেই নেমে পড়লাম।

তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি এখুনি আসছি। বলে আলমভাইয়ের স্টুডিও-তে গিয়ে একটা ক্যামেরায় ফিল্ম ভরে নিয়ে এলাম।

বীথি ভীষণ খুশি হয়ে বললো, ওয়ান্ডারফুল! এই না হলে আমার...।

জানতে চাইলাম, কি?

ও দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বললো, বড়ভাই!

তিথি টিপ্পনি কাটলো, নাকি আরো কিছু!

তার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। গল্প করতে করতে আমরা কখন যে খালার বাসায় পৌছে গেলাম বুঝতেই পারিনি।

খালা আমাদের দেখে অবাক! আমাদের খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

তাকে জানালাম, আপনি তৈরি হয়ে নিন, আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

তারপর আমরা ছবি তুলতে বেরিয়ে পড়লাম। খালাদের বাসার পাশে ফাকা মাঠ, পুকুর, খেজুরের গাছসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। তাই ছবি ওঠানোর জায়গার অভাব হলো। ওদের বিভিন্ন অ্যাংগলে বেশ কিছু ছবি ওঠালাম।

বীথি আমার কয়েকটি সিঙ্গল ছবি ওঠালো। এক সময় সে বললো, আমাদের তো এক সঙ্গে ছবি ওঠানো হলো না।

আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এক সঙ্গে মানে?

সে বললো, এক সঙ্গে মানে তোমার আর আমার।

মনে মনে এমনটি চাইলেও সংকোচে তাকে কথাটি বলতে পারছিলাম না। তাছাড়া তিথি সঙ্গে আছে। বীথি বিষয়টি তার সামনে বলে সহজ করে দিল।

তিথি আমাদের ছবি ওঠাচ্ছিল। লক্ষ্য করলাম, বীথি বেশ অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে ছবির জন্য পোজ দিচ্ছে। এমনকি আমার ঘাড়ে হাত, মাথা রেখে পোজ দিতেও কার্পণ্য করছে না।

আমি তিথির সামনে কিছুটা লজ্জা বোধ করছি দেখে বীথি বললো, লজ্জা পাচ্ছো কেন? তিথিআপু তো আমাদের বন্ধু। তাই না তিথিআপু?

তার কথা ও কাজে কেমন যেন লাগছিল।

তিথি তরল স্বরে বললো, আমাকে আর পটাতে হবে না!

দুপুরে খাওয়া–দাওয়া থেকে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে খালাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এবার আমাদেরকে দুই রিকশা নিতে হলো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম বীথি আমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে সমাধানের লক্ষ্যে বললাম, কে কার সঙ্গে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে বীথি বললো, আপু আর খালা একটায়। আমি–তুমি একটায়। আমাদের দুজনের সঙ্গে দুই গার্ডিয়ান। বলেই সে আমার রিকশায় উঠে পড়লো।

তাকে বললাম, খালা কিছু ভাববে না তো?

সে বললো, কি ভাববে? আমরা এক সঙ্গে যেতে পারি না!

রিকশা চলা আরম্ভ করলো আমরা নানান রকম গল্প করছি আর রাস্তায় পাশের সারি সারি খেজুর গাছ দেখছি। শহর থেকে কিছুটা বাইরে। তাই যানবাহনের আধিক্য নেই। দারুণ ভালো লাগছিল।

এক সময় বীথি জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, তুমি কাউকে ভালোবাসো?

তার সরাসরি এমন প্রশ্নে কিছুটা বিব্রত হলেও বললাম, হ্যা বাসি।

সে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললো, তুমি যাকে ভালোবাসো সে কি রাজশাহীর, নাকি বাইরের?

সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললাম, রাজশাহী হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এমন উত্তরে রেগে যাচ্ছে দেখে তাকে আরো রাগিয়ে দিতে বললাম, বীথি, আইসক্রম খাবে?

না। বলে সে ঝামটা দিল।

অনেকক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলো।

এবার তাকে বললাম, আচ্ছা, কি জানতে চাও বলো।

সে আবারও প্রশ্নটি করলো।

বললাম, মেয়েটি রাজশাহীতে থাকে না।

তক্ষুণি সে বলে উঠলো, মেয়েটি কি আমি?

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। নিরুত্তর থাকলাম।

সে আবার বললো, প্লিজ, বলো না মেয়েটি কি আমি?

বললাম, হতে পারে, নাও হতে পারে।

সে আক্রোশে ফেটে পড়লো।

আমরা বাসার কাছাকাছি এসে গেছি প্রায়। তাই তাকে শান্ত রাখার জন্য বললাম, বাসায় গিয়ে বলবো।

বাসায় আসতেই খালাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সে ইশারায় আমাকে ডেকে নিয়ে গেল একটা ঘরে। বিছানায় আমাকে বসিয়ে আমার মুখোমুখি বসে বললো, বলো।

বললাম, কি বলবো?

তুমি আমাকে ভালোবাসা?

তার চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা, চোখ দুটি ছলছল করছে।

বললাম, না।

তার চোখ বেয়ে ফোটা ফোটা পানি গড়িয়ে বিছানায় পড়লো।

আমি আস্তে আস্তে তার হাত দুটো আমার হাতে নিলাম। তার মুখটা তুলে ধরলাম উপরে। বললাম, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। একটা পরীক্ষা নিলাম মাত্র।

সে আমাকে দুহাতে তার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিল।

সেই থেকে শুরু...।

রাজশাহী থেকে